# সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম
## (Social Policy and, Planning and Social Work)

**ইউনিট 10**

### ভূমিকা

নীতি শব্দটি আধুনিক বিশ্বের সমাজব্যবস্থায় কাঙ্খিত উন্নয়ন ও সমাজকর্মের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়। সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন হিসেবে সমাজসেবা কার্যক্রমের স্বরূপ, প্রকৃতি, পরিচালনা ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা দেয় সামাজিক নীতি। সাধারণ অর্থে নীতি হলো কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথনির্দেশিকা। কোনো সমাজে সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ সমাজসেবামূলক ব্যবস্থা সামাজিক নীতি কাঠামোর আওতাতেই গড়ে ওঠে। সমাজসেবা ছাড়াও সামাজিক নীতির আরো উল্লেখযোগ্য পরিচয়বাহী বিষয় হলো শাসনতন্ত্র ও সামাজিক আইন এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার চুক্তিপত্র। মূলত সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে যে নীতি প্রণয়ন করা হয় তাই সামাজিক নীতি। একটি সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রণীত হয়ে থাকে। যেমন– শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিশুনীতি, জনসংখ্যানীতি, নারী উন্নয়ন নীতি, শ্রমনীতি প্রভৃতি।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-১০.১ : সামাজিক নীতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-১০.২ : সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য
পাঠ-১০.৩ : সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া
পাঠ-১০.৪ : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০
পাঠ-১০.৫ : বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২
পাঠ-১০.৬ : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
পাঠ-১০.৭ : জাতীয় শিশুনীতি ২০১১
পাঠ-১০.৮ : সমাজ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব
পাঠ-১০.৯ : সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা
পাঠ-১০.১০ : সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-১০.১১ : পরিকল্পনা ও সামাজিক পরিকল্পনা
পাঠ-১০.১২ : পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-১০.১৩ : বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা
পাঠ-১০.১৪ : সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা
পাঠ-১০.১৫ : সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

# পাঠ-১০.১ সামাজিক নীতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Social Policy)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১.১ সামাজিক নীতি ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.১.২ সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

## ১০.১.১ সামাজিক নীতির ধারণা

নীতি হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা। সমাজজীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মপন্থা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনাই হলো নীতি। সাধারণভাবে কোনো কাজ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে বাঞ্ছিত ও ইপ্সিত লক্ষ্যে উপণীত হওয়ার জন্য যেসব নিয়মকানুন, পদ্ধতি বা কর্মকৌশল, যা কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয় তাকেই নীতি বলা হয়। অন্যদিকে সামাজিক নীতি হলো সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপন্থা। সামাজিক নীতি হলো সেসব নিয়মকানুন বা কর্মপন্থা যা কেবল সমাজকল্যাণমূলক কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী, সামাজিক নীতি হলো সমাজের সেসব কার্যক্রম ও বিধিবিধান যেগুলো ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের পথ নির্দেশ করে। এসব কার্যক্রম ও বিধিবিধানগুলো সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রথার ফলশ্রুতি।

অধ্যাপক মার্শাল বলেন, সামাজিক নীতি প্রত্যয়টি সরকার গৃহীত সেসব নীতিমালার নির্দেশক, যেগুলো নাগরিকদের সেবা ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কল্যাণ নিশ্চিত করার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক এর মতে, সামাজিক নীতি হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রশাসনিক বিধান ও সংস্থার নির্দেশনার মূলনীতি, কার্যপ্রক্রিয়া ও কার্যসম্পাদনের উপায়, যা জনগণের সামাজিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সামাজিক নীতি হলো সমাজের কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণ তথা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের নিমিত্তে কতিপয় নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি বা কৌশল যা মানুষের ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ লাভ এবং সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যেখানে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং তা আদর্শ হিসেবে অনুসরণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপণীত হওয়ার প্রয়াস চালায়।

## ১০.১.২ সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য

সমাজের কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক সুসমন্বিত নীতিমালা ও কর্মকৌশল হলো সামাজিক নীতি। জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে সমাজের গতিশীলতা ত্বরান্বিত করতে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো :

১. সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশক ও অনুসরণীয় আদর্শ।
২. সামাজিক নীতি সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মপ্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কাজের শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়।
৩. সামাজিক নীতি জনগণের মানবীয় প্রয়োজন পূরণ ও সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করে।
৪. সামাজিক নীতি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সরকার ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় তা বাস্তবায়িত হয়।
৫. সামাজিক নীতি সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ অনেকগুলো বিকল্প কর্মপন্থা থেকে কোনটি গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করে দেয়।
৬. সামাজিক নীতি বাঞ্ছিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়। সুপরিকল্পিত উপায়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সামাজিক নীতি প্রণীত হয়।
৭. সামাজিক নীতি সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৮. সামাজিক নীতি সামাজিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে। কারণ সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক সময় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা । যেমন– কুপ্রথা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা প্রভৃতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব বাধা দূর করতে প্রয়োজন হয় সামাজিক কার্যক্রমের। সামাজিক নীতি এর ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

৯. সামাজিক নীতি সমাজে বসবাসরত মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। সামাজিক নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাতে মানুষ পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়।

১০. সামাজিক নীতি সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামাজিক সমতা, স্থিরতা, শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

## সারসংক্ষেপ

নীতি হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের কর্মপন্থা। সমাজজীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মপন্থা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনাই হলো নীতি। সাধারণভাবে কোনো কাজ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনা করার মাধ্যমে বাঞ্ছিত ও ইপ্সিত লক্ষ্যে উপণীত হওয়ার জন্য যেসব নিয়মকানুন, পদ্ধতি বা কর্মকৌশল যা কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাকেই নীতি বলা হয়। অন্যদিকে, সামাজিক নীতি হলো সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপন্থা। সামাজিক নীতি হলো সেসব নিয়ম-কানুন বা কর্মপন্থা, যা কেবল সমাজকল্যাণমূলক কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের লক্ষ্য ক্ষেত্রে পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজজীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের জন্য কর্মপন্থা সম্পর্কিত নির্দেশনাকে কী বলা হয়?
ক) সামাজিক নীতি খ) সামাজিক পরিকল্পনা
গ) সামাজিক কর্মসূচি ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

২। সামাজিক নীতির বৈশিষ্ট্য হলো–
i. সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশক
ii. সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মপ্রক্রিয়া
iii. বাঞ্ছিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.২ সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Social Policy Formulation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.২.১ সামাজি নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.২.১ সামাজিক নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য

কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন, মানবীয় প্রয়োজনপূরণ এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর টি.এইচ মার্শাল বলেন, সামাজিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো তিনটি যথা– দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক সমতা নিশ্চিতকরণ। অধ্যাপক স্লেক এর মতে, সামাজিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ হলো– ক) যথাসম্ভব অকালমৃত্যু, কষ্ট ও সামাজিক অনিষ্ট লাঘব করা; খ) দুর্বলদের রক্ষা

করা, যখন তারা নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়ে; এবং গ) সমাজ ও সমাজের প্রতিটি সদস্যের কল্যাণ সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। সার্বিকভাবে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

**১. সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে পথনির্দেশনা দান :** স্বীকৃত মানবীয় প্রয়োজন পূরণ ও সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় পথনির্দেশনা দান সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সামাজিক নীতি শুধু সমস্যার সমাধান দেয় না, সাথে সাথে এসব সমস্যার উদ্ভব ও প্রতিরোধেরও পথনির্দেশ দান করে।

**২. কাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিবর্তন :** সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের কাঙ্ক্ষিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন। অর্থাৎ জনগণের চাহিদা পূরণ ও সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন সাধন। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে জনগণকে সহায়তা করে।

**৩. সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান :** বিভিন্ন সামাজিক বিপর্যয়কর অবস্থা যেমন– দুর্ঘটনা, অকালমৃত্যু, বেকারত্ব, অবসর, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে মানুষের অর্থনৈতিক অক্ষমতা থেকে রক্ষা করা সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

**৪. সামাজিক সাম্য ও সমতা বিধান :** সমাজে সম্পদ ও সুযোগের সুসম বণ্টনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সাম্য ও সমতা বিধান সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে সামাজিক নীতি মানুষের মৌলিক স্বাধীনতায় সমঅধিকার নিশ্চিত করতে সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্পদ ও সুযোগের সুসম বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়।

**৫. সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপন :** সামাজিক নীতি সমাজে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ সমাজকাঠামো বিনির্মাণে প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত ও দলীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ব্যবস্থার যথাযথ অনুশীলনে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে।

**৬. উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ :** সামাজিক নীতির একটি মূখ্য উদ্দেশ্য হলো সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশনা ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সামাজিক নীতি শুধুমাত্র সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নেই সহায়তা করেনা, একইভাবে এর উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্তরায় দূর করা এবং উন্নয়নের কার্যকর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা।

**৭. নাগরিকের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা :** সামাজিক নীতির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো নাগরিকের সামগ্রিক ও সর্বোত্তম কল্যাণমূলক সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সাধারণত এ ধরনের সেবার মধ্যে সামাজিক বীমা, সামাজিক সাহায্য, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, গৃহায়ণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব সেবা প্রদানে সামাজিক নীতি সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা দান করে।

**৮. সমাজসেবার কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ :** সমাজসেবা ব্যবস্থাকে (সরকারি ও বেসরকারি) অর্থবহ, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে সামাজিক নীতি সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কী কৌশল অনুসরণ করা হবে, কী ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ করে থাকে।

**৯. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :** সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত অপরিপক্কতার কারণে এগুলোর যথাযথ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়না। সামাজিক নীতি এসমস্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদ খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

**১০. সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা :** সামাজিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা, যা উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করে ধারাবাহিক ও দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা, সম্পদ ও সুযোগের সমবণ্টন, সামাজিক সমতার নীতি অবলম্বন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে।

এছাড়াও সামাজিক নীতির আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন :

ক) সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা;
খ) সামাজিক সমস্যার উদ্ভব, বিস্তার ও প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
গ) সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, দুঃস্থ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ;
ঘ) দেশের অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়ন সাধন;
ঙ) সামাজিক সাম্য ও সমতা বিধান;
চ) জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান ইত্যাদি।

## সারসংক্ষেপ

কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন, মানবীয় প্রয়োজন পূরণ এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। প্রফেসর টি. এইচ. মার্শাল এর মতে, সামাজিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো তিনটি যথা– দারিদ্র্য দূরীকরণ, সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক সমতা নিশ্চিতকরণ। সামগ্রিকভাবে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হলো– ১) সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে পথনির্দেশনা দান, ২) কাঙ্খিত সামাজিক পরিবর্তন, ৩) সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ৪) সামাজিক সাম্য ও সমতা বিধান, ৫) সামাজিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপন, ৬) উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ, ৭) নাগরিকের সমগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা, ৮) সমাজসেবামূলক কাজের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, ৯) সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ১০) সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। টি.এইচ মার্শালের মতে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য কয়টি?

ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২। অধ্যাপক স্লেক এর মতে সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য হলো–

i. যথাসম্ভব অকালমৃত্যু, কষ্ট ও সামাজিক অনিষ্ট লাঘব করা
ii. দুর্বলদের রক্ষা করা, যখন তারা নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়ে
iii. সমাজ ও সমাজের প্রতিটি সদস্যের কল্যাণ বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.৩ সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া (Process of Social Policy Formulation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৩.১ সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.৩.১ সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের একটি সূচিন্তিত সিদ্ধান্ত। সামাজিক নীতি একটি দেশের দর্পণ বিশেষ, যার মাধ্যমে উক্ত দেশ বা সমাজের উন্নয়নের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। সামাজিক নীতিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। সামাজিক নীতি যেহেতু সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশক সেহেতু এখানে জনসমর্থন ও সহায়ক নেতৃত্বের উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়। সামাজিক নীতি একটি বহুমুখী জটিল প্রক্রিয়া। কারণ এতে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপাদানও সক্রিয় থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক সকল দিক বিবেচনায় এনে জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে সামাজিক নীতি প্রণয়নে কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াসমূহ হলো :

**১. নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ :** কোনো বিষয়ে নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন তা নির্ধারণের মাধ্যমেই নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ শুরু হয়। নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে জনগণের সচেতন অংশ এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন দল ও সংস্থা। সাধারণত সরকার নিজ থেকে কোনো বিষয়ে নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করে না; বরং এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় জনমতের চাপ ও প্রত্যাশার মাত্রা সরকারকে নীতি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে।

**২. যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** এটি নীতি প্রণয়নের দ্বিতীয় ধাপ। জনগণের আগ্রহ ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সামাজিক নীতি নির্ধারণের জন্য যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যথাযথ ও ব্যাপক জরিপ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই নীতি প্রণয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব।

**৩. কমিটি গঠন :** এ পর্যায়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে নীতি প্রণয়নের জন্য একটি কার্যকর কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সাধারণত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সদস্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়াও সাংবাদিক, সমাজকর্মী, সমাজচিন্তাবিদগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

**৪. নীতি বিশ্লেষণ :** নীতি প্রণয়নের কার্যপ্রণালী স্থির করার পর সে অনুযায়ী গঠিত কমিটি নীতি প্রণয়নের জন্য নীতির আবশ্যকতা, সামাজিক বাস্তবতা, নীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতা ও সমস্যা, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদান করেন। পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করেই খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হয়।

**৫. খসড়া নীতি প্রণয়ন :** এ পর্যায়ে কমিটির মতামতের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষামূলক খসড়া নীতি প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে নীতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সম্পদের উৎস্য, কত সময়ে নীতি বাস্তবায়িত হবে, প্রণীত নীতি জনগণের জন্য কতটুকু কল্যাণ বয়ে আনবে, জনগণ প্রণীত নীতি গ্রহণ করবে কি না তা নির্দিষ্ট করতে হয়। প্রণীত খসড়া নীতি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হয়।

**৬. খসড়া নীতি চূড়ান্ত প্রণয়ন :** সামাজিক নীতি প্রণয়নের এ পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত খসড়া নীতির ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মূল্যায়ন, সংশোধন, সংযোজন ও পর্যালোচনা করে খসড়া নীতি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

**৭. জনসমর্থন আদায়ে আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ :** প্রণীত খসড়া নীতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য এ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন– রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সেমিনার, নাটক, বিভিন্ন ব্লগ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ প্রচারকার্য চালানো হয়ে থাকে। এছাড়া সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের এর মাধ্যমেও প্রচারকার্য চালানো হয়। এক্ষেত্রে প্রণীত খসড়া নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।

**৮. নীতির পরীক্ষামূলক অনুশীলন :** এ পর্যায়ে খসড়া নীতি পরীক্ষামূলকভাবে অনুশীলন করা হয়। পরীক্ষামূলক প্রয়োগের মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের ফলাফল ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দূর করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষে নিকট প্রেরণ করা হয়।

**৯. নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন :** খসড়া নীতিতে যেসকল ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা থাকে তা দূর করে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকে।

## সারসংক্ষেপ

সামাজিক নীতি সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। সামাজিক নীতি একটি দেশের দর্পণ বিশেষ, যার মাধ্যমে উক্ত দেশ বা সমাজের উন্নয়নের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। সামাজিক নীতিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। সামাজিক নীতি যেহেতু সামাজিক উন্নয়নের পথনির্দেশক সেহেতু এখানে জনসমর্থন ও সহায়ক নেতৃত্বের উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়। সামাজিক নীতি একটি বহুমুখী জটিল প্রক্রিয়া। কারণ এতে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপাদানও সক্রিয় থাকে। সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতগুলো সুনির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। পর্যায়গুলো হলো– ১) নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ, ২) যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ৩) নীতি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন, ৪) নীতি বিশ্লেষণ, ৫) খসড়া নীতি প্রণয়ন, ৬) খসড়া নীতির চূড়ান্ত প্রণয়ন, ৭) জনসমর্থন আদায়ে আনুষঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ, ৮) নীতির পরীক্ষামূলক অনুশীলন এবং ৯) নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ কোনটি?

ক) নীতির অনুভূত প্রয়োজন নির্ধারণ খ) যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গ) খসড়া নীতি প্রণয়ন ঘ) নীতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ

২। সামাজিক নীতি প্রণয়নে গঠিত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন–

i. সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা
ii. অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি
iii. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সদস্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ (National Education Policy 2010)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৪.১ বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৪.২ বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৪.৩ বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

### ভূমিকা

একটা জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যপূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তাচেতনায় অগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। স্বাধীনতার পরপরই একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ১৯৭৪ সালে গণমুখী আধুনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সময়ের প্রয়োজনে এটি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিশীল নেতৃত্বদানে উপযোগী মানবতাবাদী, মননশীল, যুক্তিবাদী, কুসংস্কারমুক্ত, অসম্প্রদায়িক ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা।

### শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুসম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও কৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপ :

১) শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
২) ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ তথা জাতি গঠনে সহায়তা করা।
৩) মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলী যেমন– ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার, সচেতনতা, মুক্তিবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো।
৪) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
৫) দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তাচেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬) দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭) জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণী–বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮) বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯) গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য ভিন্ন মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০) মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১) বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২) জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩) শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪) সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা, এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮) শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯) সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২) পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩) দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪) সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫) দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬) শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭) বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮) শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০) মাদকজাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

## প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

### ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়সী শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে– শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন। অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

### খ. প্রাথমিক শিক্ষা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। একাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

### প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।

২. কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সবধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।

৩. শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যাবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।

৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা।

৫. শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবনদক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৭. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।

৮. সবধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

১. প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
২. প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৩. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।
   প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

## বিভিন্ন ধারার সমন্বয়

১. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা– সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সবধরনের মাদরাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।
২. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সবধরনের মাদরাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।
৩. বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রেজিষ্ট্রিকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শণ্ডরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাধারণ কিণ্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম ও সবধরনের মাদ্রাসাসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়মনীতি মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

## শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে। সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি-সহজপাঠ ও অনুশীলন পুস্তকভিত্তিক হবে। মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণিসমূহে প্রয়োজনানুসারে জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণি থেকে সহশিক্ষাক্রম বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণিতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

## ভর্তির বয়স

১. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।
২. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

## বিদ্যালয়ের পরিবেশ

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে সেদিকে নজর দেওয়া হবে এবং শিক্ষা পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক, পঠনে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক।

২. সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

## শিক্ষা সামগ্রী

প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথিমক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক পঠন সামগ্রী এবং অনুশীলন পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও অনুশীলন সংবলিত পুস্তক) প্রণয়ন করবে। সকল পাঠ্যপুস্তক সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল করা হবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।

## ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান

১. দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।

২. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধূলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।

৩. দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।

৪. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হবে।

৫. হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

৬. মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

৭. বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণি শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন অষ্টম শ্রেণি শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

## আদিবাসী শিশু

১. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।

২. আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।

## প্রতিবন্ধী শিশু

১. সবধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব সুযোগ-সুবিধা। যেমন– শৌচাগার ব্যবহারসহ চলাফেরা করা ও অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

২. প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনা করা হবে।
৩. প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

### পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু

এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনাখরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

### শিক্ষণ পদ্ধতি

শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হবে এবং সেজন্য সহায়তা দেওয়া হবে।

### শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণিতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণি শেষে আপাতত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

### বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

#### বয়স্ক শিক্ষা

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলা। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে স্বাক্ষর, লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন এবং পেশাগত দক্ষতায় উন্নত করে তোলা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকলকে সাক্ষর করে না তোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

#### উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে যায় এই ব্যবস্থায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী যোগ্যতাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় উপযুক্ত শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।

### মাধ্যমিক শিক্ষা

#### উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
২. কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
৩. মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে।

৪. বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
৫. নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারার অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

### শিক্ষার মাধ্যম

এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা, তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশিদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

### শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

১. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা– বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ধারায় এসকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সেই ধারা-সংশিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।
২. ধারা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধারার শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের প্রয়োজনভিত্তিক বিন্যাস এবং সেই অনুসারে স্ব স্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করা হবে।
৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।
৪. মাধ্যমিক স্তরে মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহ ব্যতীত সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ ধারার বিশেষ বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

### শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১ : ৩০ এ উন্নীত করা হবে।

### শিক্ষক নিয়োগ

সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে এবং তাঁদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে।

### শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কাজে যোগদানের আগে মৌলিক শিক্ষকতা– প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শূন্যপদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

### শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

দশম শ্রেণি শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণির শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

## বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। দেশের প্রয়োজন ছাড়াও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
৩. দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

## মাদ্‌রাসা শিক্ষা

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবনধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও তার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেজন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা:) এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ করে তোলা।
২. দ্বীন ও ইসলামের ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুকরণীয় চরিত্র গঠন এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা ও ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবনযাপনের জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।
৩. শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।
৪. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।

## ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো– প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান। প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।

নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। তবে সামাজিক ও সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে নৈতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

## উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। বর্তমানে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক

নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগত সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস আবশ্যক। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে (যথা– বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়) বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেই আলোকে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নিয়মানুসারে চালিত হতে হবে।

### উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান।
২. অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদান করা।
৩. পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
৪. নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
৫. আধুনিক ও দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
৬. জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।
৭. জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী হতে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি।
৮. মেধার বিকাশ এবং সৃজনশীল নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন।
৯. জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি।

### প্রকৌশল শিক্ষা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই, আমাদের সমাজেও সাধারণ মানুষের জীবনে সকলক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান এবং এগুলোর প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সামাজিক জীবনযাত্রার পটপরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজ জীবনের কার্যধারাতেও আসছে গতিশীল পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে। প্রকৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো– সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী, দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা যাতে তারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন। সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া যাতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ায় প্রকৌশলীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

### চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

একটি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠীই শুধু দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা, রোগ প্রতিরোধমূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং যথাযথ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা। সেলক্ষ্যে যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে হবে। একদিকে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে অন্যদিকে তারা যেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. আপামর জনগণের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্তমানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য জনশক্তি গড়ে তোলা।
২. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরকারিভাবে সকলের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি করা।

৩. চিকিৎসা পেশা অন্যান্য পেশার তুলনায় স্পর্শকাতর এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত হওয়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল, সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন সে লক্ষ্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল উন্নতির সুফল দেশের জনগণের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা এবং এঁদের সবাইকে সমাজের ও মানব সেবায় অনুপ্রাণিত করা।

৫. দেশবাসীর ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলীর মোকাবিলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬. চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে এ দেশের স্থানীয় রোগ ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

### বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রহস্যকে বিজ্ঞান উন্মোচন করে যাচ্ছে। এটি একদিকে মানবজাতির অজানাকে জানার কৌতূহলকে পূরণ করে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান প্রতিনিয়তই নানা ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারের ভেতর দিয়ে মানব সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা জাতিকে দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে।

২. বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

### তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করে সর্বক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা এনে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করার ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহসহ সম্ভাবনাময় রপ্তানিখাত হিসেবে সফটওয়্যার, ডাটা প্রসেসিং বা কলসেন্টার জাতীয় service industry বিকাশে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. উপর্যুক্ত কর্মযজ্ঞের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান ও গুণসম্পন্ন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির প্রচেষ্টা চালানো।

২. তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বিজ্ঞানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ।

### ব্যবসায় শিক্ষা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাকে ব্যবসায় শিক্ষা বলে এই নীতিমালায় অভিহিত করা হচ্ছে। এ শাখায় শিক্ষা যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে পারলে চাকরি এবং চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায়কে আত্মকর্মসংস্থানভিত্তিক জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিস্তৃত পণ্যের বাজার এবং তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত। তাই বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব ও চাহিদা অতি উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা।
২. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
৩. একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা।
৪. আর্থিক, ব্যবসায়িক ও কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সহায়তা করা এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপক সৃষ্টি করা।
৫. শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে ঝরে পড়লে অর্জিত শিক্ষা দ্বারা আত্মকর্মসংস্থানের পথ সুগম করা।
৬. ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের পথ সুগম করা।

## কৃষিশিক্ষা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষিপ্রধান বাংাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। উচ্চতর কৃষিশিক্ষা বলতে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি ও মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়। কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।
২. জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
৩. প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশের স্থলজ ও জলজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যাপক অভিঘাত মোকাবিলা করে কৃষি উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য জোরদার গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ। কৃষিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি।
৫. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন।

## আইনশিক্ষা

আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী সকল ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধান অনুযায়ী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইনশিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশে ন্যায়বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্যও সঠিক ও যুগোপযোগী আইনশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আইনশিক্ষার দুটি দিক রয়েছে তা হলো– পেশাগত ও ব্যবহারিক। দেশের প্রচলিত আইনশিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনোটারই সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আইনশিক্ষার মান যেমন নানা কারণে নিম্নমুখী হচ্ছে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কল্যাণকর ফলাফল সব সময় লক্ষিত হচ্ছে না। তাই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইন শিক্ষার্থীরা যাতে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে পারে সে লক্ষ্যে আইনশিক্ষাকে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োগমুখী করা হবে।

## নারীশিক্ষা

দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীশিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে। সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন

ও সুসম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

১. নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা।
২. সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ করা ও দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা পালন করা।
৪. যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও তার সম-অধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা।

## কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা

একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। এ শিক্ষার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও হস্তশিল্প, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য বা অঙ্গবিক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে এবং তার চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা যায়। এ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের একদিকে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করা যায়, অন্যদিকে এই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

## বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী

**ক. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা :** বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত শিশুদের আওতায় পড়ে দৃষ্টি, শ্রবণ, শরীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধিত্বের মাত্রানুসারে এদের মৃদু প্রতিবন্ধী, মাঝারি প্রতিবন্ধী ও গুরুতর প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধিত্বের ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে, তবে প্রতিবন্ধিত্বের গুরুতর মাত্রার কারণে যাদেরকে এভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

**খ. স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা :** বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের একটি অবহেলিত অংশ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষিত জাতিগঠনে সাধারণ শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটোকে বাদ দিলে সাধারণ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না। শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী হবে, তারা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিখতে সমর্থ হবে। সময়ানুবর্তিতা শারীরিক শিক্ষার অন্যতম পাঠ। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এ উপায়ে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বরেণ্য ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে তাহলে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। খেলাধুলার উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মাদকদ্রব্যের মতো ভয়াল অভিশাপ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারবে না।

**গ. স্কাউট, গার্লস গাইড ও বিএনসিসি :** এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দেশের শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণতরুণীদের যথাক্রমে স্কাউট ও গার্লস গাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী, সেবাপরায়ণ, স্বাস্থ্য সচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখা। স্কাউট ও গার্লস গাইড কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণ-তরুণীদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন ও পরোপকারী হিসেবে গড়ে ওঠার গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান করা।

**ঘ. ব্রতচারী :** অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায় ব্রতচারী কার্যক্রম অনেকটা স্কাউটিং ও গার্লস গাইডিংয়ের অনুরূপ, তবে এটি এই দেশের সংস্কৃতির ভেতর থেকে উঠে এসেছে। এটি গীত ও নৃত্য–ভিত্তিক সুশৃঙ্খল একটি কার্যক্রম, যা বিদ্যালয়ে বিনোদন চর্চার বিষয় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহকে উপজীব্য করে ছড়া ও গীতএর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। যাঁরা তা পরিবেশন করেন এবং যাঁরা শোনেন-দেখেন সবাইকে এই কার্যক্রম

ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে সহজেই। ব্রতচারী কার্যক্রম সিলেট, ঢাকা, খুলনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং জয়পুরহাটের অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। নীতিগতভাবে ব্রতচারী কার্যক্রমের স্বীকৃতি দেয়া হবে ও অন্যান্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু করার জন্য উৎসাহ দেয়া হবে।

## ক্রীড়াশিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণ-তরুণীদের পূর্ণবিকাশে শরীরচর্চা ও ক্রীড়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা, সৃজনশীলতা এবং আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্থ দেহ ও মনের সমন্বয় মানব উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শরীর, মন ও মেধার সমন্বয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকলেও দেশে প্রচলিত ক্রীড়া ও শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষে। উল্লেখ, বর্তমানে ক্রীড়াশিক্ষা ও এক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এদেশে ক্রীড়াশিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণস্পন্দনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। দেশের নাগরিকদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজলভ্য করার দায়িত্ব হলো গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের। এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

## পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করছেন সেগুলো হলো জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিত ও মনন সম্পর্কিত। এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পথমটি মূল্যায়ন করা হয়। এটি আরো কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিকও যাচাই করার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি তৈরী করা আবশ্যক। পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## শিক্ষার্থীকল্যাণ ব্যবস্থা ও নির্দেশনা

অনেক সময় বহু সমস্যার আবর্তে অনেক শিক্ষার্থী অত্যাচারিত, বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, ফলে অনেকের জীবন নষ্ট হয়। তাই শিক্ষার্থী নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা হবে। তা করা হলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার এবং শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার পরিবেশ উন্নত করা যাবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

## শিক্ষার্থী ভর্তি

একজন শিক্ষার্থীকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে তাকে তার মেধা ও মননের উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর আঞ্চলিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তে তার মেধা ও প্রবণতা যেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির মাপকাঠি হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। কোনো কোনো স্কুলে ভর্তি করার জন্যে কোমলমতি শিশুদের নানারকম তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করে প্রথম শ্রেণিতেই বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রাথমিকউত্তর সকল পর্যায়ে ভর্তির জন্য নীতিমালা তৈরি করা হবে এবং সেগুলো অনুসরণ করা হবে। প্রসঙ্গত যে কোনো পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে মাতা-পিতা উভয়ের নাম অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম উল্লেখ করা হবে এবং প্রাথমিক পরীক্ষা পাসের সনদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এদের নাম থাকবে।

## শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগপোযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা। দেশের প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর র্নিভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। তাই আশানুরূপ ফলফাভ হচেছ না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এইচএসটিটিআই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা হবে।

## শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

সামাজিক বাস্তবতা সামনে রেখে সকল স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা এবং দায়-দায়িত্বের বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করে তা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়টির দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে– শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা শুধুমাত্র সুবিন্যস্ত বাক্য গাঁথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকৃত অর্থে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া না হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মদক্ষ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক একজন সফল অবদানকারী হিসেবে গড়ে তোলা জরুরি। এজন্য শিক্ষকদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, শিক্ষাখাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ শিক্ষকদের দেওয়া হবে। আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, মর্যাদা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ জরুরি। তাদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা মূল্যায়নের অব্যাহত ব্যবস্থা থাকবে।

## শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হবে যে প্রকৃত শিক্ষা যেন জীবনঘনিষ্ঠ হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়।

## শিক্ষা প্রশাসন

শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনের ওপর। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং নাগরিকগণের জন্য শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রশাসনকে আধুনিকায়ন প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

## সারসংক্ষেপ

একটা জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যপূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। স্বাধীনতার পরপরই একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৯৭৪ সালে গণমুখী আধুনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সময়ের প্রয়োজনে এটি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ নামে প্রজাতন্ত্রের অনুমোদন লাভ করে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিশীল নেতৃত্বদানে উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী কুসংস্কারমুক্ত, অসম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসহ মোট ২৮টি বিষয় এবং ২টি সংযোজনীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে আলোচিত ২৮টি বিষয় হলো– ১) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ২) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, ৩) বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ৪) মাধ্যমিক শিক্ষা, ৫) বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, ৬) মাদরাসা শিক্ষা, ৭) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, ৮) উচ্চশিক্ষা, ৯) প্রকৌশল শিক্ষা, ১০) চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, ১১) বিজ্ঞান শিক্ষা, ১২) তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ১৩) ব্যবসায় শিক্ষা, ১৪) কৃষি শিক্ষা, ১৫) আইনশিক্ষা, ১৬) নারীশিক্ষা, ১৭) কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা, ১৮) বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্লস গাইড এবং ব্রতচারী, ১৯) ক্রীড়াশিক্ষা, ২০) গ্রন্থাগার, ২১) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, ২২) শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা, ২৩) শিক্ষার্থী ভর্তি, ২৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ২৫) শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব, ২৬) শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক, ২৭) শিক্ষা প্রশাসন এবং ২৮) শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষার কয়টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে?
ক) ২০ খ) ২৫
গ) ৩০ ঘ) ৩৫

২। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা কোন শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েচে?
ক) পঞ্চম শ্রেণি খ) ষষ্ঠ শ্রেণি
গ) সপ্তম শ্রেণি ঘ) অষ্টম শ্রেণি

৩। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কত?
ক) ১ : ৩০ খ) ১ : ৪০
গ) ১ : ৫০ ঘ) ১ : ৬০

৪। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো–
i. শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক চরিত্র গঠন
ii. প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান
iii. প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী কৃষিশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো–
i. দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
ii. জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
iii. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১০.৫ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ (Bangladesh Population Policy 2012)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৫.১ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির রূপকল্প কী তা বলতে পারবেন।
১০.৫.২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারন।
১০.৫.৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৫.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যা কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার হলো সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশের মানুষের এ সকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৭৬ সালে একটি জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালে আরও একটি জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করা হয়। ২০০৪ সালের জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য ছিল ২০১০ সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার-১ অর্জন করা। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় কর্মসূচিতে গতিশীলতা আনার জন্য জনসংখ্যানীতিকে হালনাগাদ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয় জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২।

### জাতীয় জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করার যৌক্তিকতা

২০১১ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ। এই জনসংখ্যা প্রতিবছর ১৮-২০ লাখ বাড়ছে। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামোর ওপর প্রচণ্ড চাপ বাড়ছে। তাই দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি ও কৌশলসমূহকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য।

### রূপকল্প

বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

### উদ্দেশ্যসমূহ

১. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার ৭২% এ উন্নীত করে মোট প্রজনন (TFR) হার ২.১ এ হ্রাস করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার ১ (NRR=১) অর্জন করা;
২. পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করে সক্ষম দম্পতিদের কাছে পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং দরিদ্র ও কিশোর কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমন ও এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কাউন্সেলিং সেবাকে প্রাধান্য দেয়া;
৩. মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৪. নারী-পুরুষের সমতা (Gender equity) ও নারীর ক্ষমতায়ন (Women's empowerment) নিশ্চিত করা এবং পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে লিঙ্গবৈষম্য (Gender discrimination) নিরসনে কর্মসূচি জোরদার করা;

৫. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে সম্পৃক্ত করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
৬. সকল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য সহজলভ্য করা।

## জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে মুখ্য কৌশলসমূহ

### ১. গ্রহীতামুখী সেবা

গ্রহীতামুখী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবাকেন্দ্রিক ব্যবস্থা ও বাড়ি বাড়ি সেবাকে জোরদার করা এবং একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা :

(ক) বিদ্যমান জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সেবাকেন্দ্রসহ স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা;
(খ) বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহীতা সেবা নিশ্চিত করা;
(গ) সকল সক্ষম দম্পতি বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ি বাড়ি সেবা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং মাঠ পর্যায় থেকে রেফারেল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এছাড়া ই-প্রজনন সেবা প্রচলন করা;
(ঘ) নব-দম্পতি, কিশোর-কিশোরী ও এক বা দুই সন্তানের দম্পতিদের অগ্রধিকারভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় নিয়ে আসা;
(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবার অপূর্ণ চাহিদা সংলিত দম্পতিদের চিহ্নিত করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
(চ) প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সেবা প্রদানকারীদের সহায়তায় সকল প্রসব সেবা নিশ্চিত করা;
(ছ) সকলের জন্য এবং বিশেষ করে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য যৌনরোগ, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য ও সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
(জ) বসতবাড়ীতে ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ভিটামিন-এ এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সরবরাহ নিশ্চিত করা। শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের অপুষ্টি রোধ করা এবং এ বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম বৃদ্ধি করা;
(ঝ) সকল মহিলা ও শিশুকে টিকাদান নিশ্চিত করার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
(ঞ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে দিবা-রাত্রি সেবা নিশ্চিত করা। সকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসক, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার, ফার্মাসিস্ট, এমএলএসএস ও আয়া নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মিডওয়াইফ হিসেবে তৈরি করা;
(ট) সকল সেবাকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও যন্ত্রপাতির নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবাদান কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর প্রাপ্যতা সহজলভ্য করা এবং কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
(ঠ) অবহিতকরণ ও স্বেচ্ছায় সম্মতির (Informed choice and voluntarism) ভিত্তিতে সকল সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা;
(ড) দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে বিশেষায়িত (Specialized) জরুরি প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

### ২. নগর স্বাস্থ্যসেবা

শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকার বস্তি, ভাসমান ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা। বিশেষ করে শহরে গ্রহীতামুখী সেবা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

**৩. এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা কর্মকৌশল**

বাংলাদেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সেবা গ্রহণে এলাকাভিত্তিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষার অগ্রগতির তারতম্য রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে বৃহত্তর পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলের পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক এবং অপেক্ষাকৃত কম অগ্রগতিসম্পন্ন এলাকায় বিশেষ কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা :

(ক) স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থানীয়ভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা;

(খ) দেশের উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উপকূলীয় এলাকার বাস্তবতার আলোকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(গ) স্থানীয়ভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকাণ্ডের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচির সমন্বয় করা ও প্রয়োজনে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঘ) স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সক্ষম দম্পতিদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ভিত্তিতে গ্রহীতা বিভাজন (Client segmentation) করা ও উপযুক্ত সেবা নিশ্চিত করা।

**৪. আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ (BCC) কার্যক্রম**

জনসংখ্যা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রমে আচরণ পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা :

(ক) "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়"–এ শ্লোগানকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;

(খ) মা ও শিশুমৃত্যু হ্রাস ও পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা এবং বিদ্যমান সুবিধা ও অসুবিধাসমূহসহ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক এগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচারণা জোরদার করা;

(গ) প্রসব-পূর্ববতী, প্রসবকালীন এবং প্রসব-পরবর্তী সেবা গ্রহণে আচরণ পরিবর্তনে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রজননতন্ত্র ও যৌনরোগের সংক্রমণ, এইচআইভি/এইডসসহ যাবতীয় সংক্রামক ব্যাধি রোধকল্পে আচরণ পরিবর্তনমূলক প্রচারণায় সহায়তা করা;

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং অন্যান্য গণযোগাযোগ মাধ্যমে জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্যসহ বহুমুখী এবং হৃদয়গ্রাহী জরুরি বার্তা নিয়মিত প্রচার নিশ্চিত করা;

(চ) লিঙ্গভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করা;

(ছ) তৃণমূল হতে জেলা পর্যায় পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন, সরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন, মহিলা নেতৃবৃন্দ, নবদম্পতি ইত্যাদির গ্রুপভিত্তিক বিষয় নির্বাচনপূর্বক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা;

(জ) অঞ্চলভিত্তিক ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বার্তা তৈরি ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর সহায়তায় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উল্লিখিত বার্তা প্রচার নিশ্চিত করা;

(ঝ) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক তাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রচার করা। বিশেষ করে সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে বেসরকারি রেডিও ও টেলিভিশনে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রচারণার ব্যবস্থা করা;

(ঞ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

### ৫. কিশোর-কিশোরীকল্যাণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি কিশোর-কিশোরী (Adolescent) এবং কিশোরীদের প্রতি তিন জনের একজন হয় মা অথবা গর্ভবতী। আইনগতভাবে ১৮ বছরের আগে বিয়ের বিধান না থাকলেও কিশোর-কিশোরীদের দুই-তৃতীয়াংশের বিয়ে ১৮ বছরের পূর্বেই হচ্ছে। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং নিবন্ধনকারীদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। আরো যেসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ নীতি অগ্রসর হবে তা হলো :

(ক) বিলম্বে বিয়ে ও যথেষ্ট বিরতিতে সন্তান নেয়ার পক্ষে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করা;
(খ) অবিবাহিত মহিলাদের গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; ঋণ সুবিধা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ করা;
(গ) স্কুল ও কলেজে কিশোর-কিশোরীদের জন্য মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অবহিতকরণসভা, রচনা এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন করা;
(ঘ) কিশোর-কিশোরীদেরকে স্বাস্থ্য ও জীবনমুখী দক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সেবা প্রদানকারীদের সচেতন করা;
(ঙ) কিশোর-কিশোরীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

### ৬. বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ

জনসংখ্যা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা :

(ক) অধিভুক্তিকৃত এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) কে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সেবাবঞ্চিত এলাকাসমূহে কাজ করতে উৎসাহিত করা;
(খ) সরকারের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের সহায়তায় কিংবা যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
(গ) সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে আলোচনা ও সমন্বয় জোরদার করা এবং সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা;
(ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাত প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর "ফোকাল পয়েন্ট" হিসেবে কাজ করা।

### ৭. নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী–পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব

নারী-পুরুষের অংশীদারিত্ব ও সমতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীসমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। কিছু কিছু পরিবারে মেয়েশিশুরা পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেশিশুদের চেয়ে কম সুযোগ পাচ্ছে। সমাজে গভীরভাবে গ্রথিত কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী-পুরুষের মাঝে অনেক বৈষম্যমূলক আচরণের সৃষ্টি হয়েছে। মহিলারা এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম পারিশ্রমিকের কাজে নিয়োজিত আছে এবং পুরুষের চেয়ে কম আয় করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা সহজে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করা :

(ক) সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জেণ্ডার সেন্সিটিভ (Gender sensitive) কর্মকৌশল প্রণয়ন করা;
(খ) উপযুক্ত শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
(গ) শহর ও গ্রামের কর্ম এলাকায় দিবা-যত্ন কেন্দ্রের (Day care centre) ব্যবস্থাসহ শিশুযত্নের প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

(ঘ) নারী উন্নয়নে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহকে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;
(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সকল সমাজকল্যাণ ও বিভিন্ন ঋণদান কর্মসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়কে সম্পৃক্ত করা;
(চ) নারী ও শিশু পাচারসহ সকল ধরনের নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন বন্ধ করা;
(ছ) নারীদের পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরুষদের আরো দায়িত্বশীল করে তোলার লক্ষ্যে সচেতনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
(জ) স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

**৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন**

সকল পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রে মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনংখ্যা নীতি কাঠামোর আওতায় সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনার করার জন্য দক্ষ জনশক্তি অপরিহার্য বিধায় নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা :

(ক) সরকারি পর্যায়ে বর্তমান জনসংখ্যা অনুপাতে উন্নত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের সংখ্যা নির্ধারণ, নিয়োগ ও তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং পাশাপাশি নিয়মিত/চাকরিরত অবস্থায় (In-service) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
(খ) সময়ে সময়ে নিয়োগবিধি হালনাগাদ করা, ক্যারিয়ার প্ল্যান (Career plan) তৈরি এবং সঠিক সময়ে পদোন্নতির পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(গ) বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ইসস্টিটিউটসমূহকে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা এবং তাদের মাধ্যমে সরকারি এবং বেসরকারি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা;
(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/ ইসস্টিটিউটসমূহে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি নিশ্চিত করা। সকল পর্যায়ের একাডেমিক ও প্রশিক্ষণ ইসস্টিটিউটে চাকরিপূর্ব (Pre-service) প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

**৯. আইনগত ব্যবস্থা**

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা :

(ক) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে একক সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কাজের দ্বৈততা পরিহার করা;
(খ) জন্মনিবন্ধন (Birth registration) তথ্য অনুযায়ী সকল শিশুর নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা, উপযুক্ত বয়সে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা এবং কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে (Early marriage) রোধ করা। জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুলে ভর্তির সময় এবং বিবাহ নিবন্ধনের সময় জন্মসনদপত্র ব্যবহার করা;
(গ) বিদ্যমান আইনের আলোকে সকল নাগরিকের বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ও নিশ্চিত করা। বিবাহ নিবন্ধনের পূর্বে জন্মনিবন্ধন সনদপত্র অনুযায়ী বয়স নিশ্চিত করা।

**১০. সামাজিক ব্যবস্থা**

**বয়স্ক, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণমূলক সেবা :**

বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে দরিদ্র, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী। এসব দরিদ্র, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার (Social security/safety net) ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

**১১. জনসংখ্যা ও পরিবেশ**

শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসন স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুযোগ এবং বায়ু দূষণ প্রতিনিয়ত পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে। এসব সমস্যা সমাধানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা :

(ক) গ্রাম ও শহরাঞ্চলে কৃষিজমি নষ্ট করে আবাসন ও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা নিরুৎসাহিত করে পরিকল্পিত আবাসন ও শিল্প-কারখানা স্থাপন করা;
(খ) গ্রামে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি (Social afforestation program) শক্তিশালী করা এবং শহর ও নগরে দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(গ) সকল নাগরিকের জন্য আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং আর্সেনিকমুক্ত পানির বিকল্প উৎস চিহ্নিত করা;
(ঘ) যথাযথ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যানবাহনসৃষ্ট দূষণ কমিয়ে আনা;
(ঙ) সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বস্তি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা;
(চ) পৌরসভা/সিটি করপোরেশন কিংবা অন্যান্য পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শহর, নগর ও হাট-বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা;
(ছ) গ্রাম এলাকায় খাল ও পুকুর খননের কার্যক্রমকে সহায়তা এবং ভূমিক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা এবং নদী ও জলাশয় ভরাট করে আবাসন ও শিল্পস্থাপন নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
(জ) জনসংখ্যা ও পরিবেশকে সর্বদাই সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টিতে বিবেচনায় রেখে কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

### ১২. নগরমুখিতা নিরুৎসাহিত করা ও পরিকল্পিত নগরায়ন

গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে গ্রাম ও শহরের নাগরিক সুবিধাসমূহের ব্যবধান কমিয়ে আনা ও গ্রামে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা।

### ১৩. সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার

আদমশুমারি, জনমিতিক জরিপ ও বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল জনসংখ্যা তথ্যের মূল উৎস। দেশে নিয়মিত আদমশুমারি, জরিপ ও গবেষণা পরিচালিত হলেও প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এর পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকৌশলের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা :

(ক) জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নিয়মিত জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা;
(খ) জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি গবেষক, নীতি-নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, ব্যবস্থাপক এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
(গ) লিঙ্গভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং জনসংখ্যানীতির কার্যকর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্য সূচক নির্ধারণ করা;
(ঘ) সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারে আধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সকল প্রকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা।

### ১৪. প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ (dccentralization) এবং সকল কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ (community participation) অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা :

(ক) প্রশাসনিক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনসংখ্যা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সেবাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা;

(খ) চাহিদাভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে তার আলোকে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্টেকহোল্ডার ও সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মহিলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(গ) প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহ/গঠন ও এর যথাযথ ব্যবহার করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের (উপজেলা ও ইউনিয়ন) কমিটিসমূহকে কার্যকর করাসহ ক্ষমতা প্রদান করা;

(ঘ) স্বচ্ছ প্রশাসন ও জনগণের অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা শক্তিশালী করা এবং কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলা প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা;

(ঙ) ইউনিয়ন ও মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাতৃমঙ্গল ক্লাব ও এ ধরনের সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা।

### ১৫. পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী আমদানি করে থাকে। দেশে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ-প্রণোদনা প্রদান এবং সকল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার (Contraceptive sccurity) জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিশেষ করে, শ্রমঘন (Labour intensive) এলাকায় এ কাজে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা।

### ১৬. বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয়

সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করে এ নীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়ন করা।

### জনসংখ্যা কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

**ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ কার্যক্রমে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জেলা পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থিত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন– হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে। এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও পালন করবে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের সহায়তায় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন করবে। অধিকন্তু, জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সচিবালয় হিসেবে এ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে এবং পরিষদের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি এবং জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে।

**খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় :** জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যথা– বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিসিএস প্রশাসন একাডেমির শিক্ষাক্রমে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ মন্ত্রণালয় বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

**গ) অর্থ মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় দেশের পরিকল্পিত জনসংখ্যা ও এর উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবে।

**ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী উন্নত মান বজায় রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা উৎসাহিত করার কার্যক্রম জোরদার করবে। এছাড়া বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অপরাপর শিক্ষা

উপকরণে অধিক জনসংখ্যা ও এর ভয়াবহতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবন-দক্ষতা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সময়োপযোগী করে অন্তর্ভুক্ত করবে। একইভাবে জনমিতি এবং জনসংখ্যা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোর্সের উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গবেষণা কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

**ঙ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী উন্নত মান বজায় রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিকল্পিত পরিবার, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা উৎসাহিত করার কার্যক্রম জোরদার করবে। এছাড়া বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অপরাপর শিক্ষা উপকরণে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবন-দক্ষতা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সময়োপযোগী করে অন্তর্ভুক্ত করবে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সমাজের সকল স্তরে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে।

**চ) কৃষি মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে। এ মন্ত্রণালয় তার মন্ত্রণালয়াধীন সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কৃষিকাজে নিয়োজিত জনগণকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক পরিবারের আয়-বৃদ্ধিকরণ ও দুই সন্তানের পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়া কাউন্সিলিং দ্বারা শহরমুখী গমন নিরুৎসাহিত করতে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

**ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যমে স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষের সমতা, যৌনরোগ ও এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে তথ্য প্রচারে সময় ও সম্পদ বরাদ্দ করবে। পাশাপাশি এসব বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকল শ্রেণির সংবাদপত্র ও বেসরকারি গণমাধ্যমকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত করবে।

**জ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে। বিদ্যমান জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কমিটি এবং ওয়ার্ড পরিবার পরিকল্পনা কমিটিকে সক্রিয় করে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে গতিময়তা (Momentum) আনা সম্ভব। উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটিগুলোর সভা আয়োজন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রজনন স্বাস্থ্য ও নারী-পুরুষের সমতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এ মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহিলা সমবায় সমিতিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ সমিতিগুলো সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রচারণাসহ সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকাগুলোতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করতে পারে।

**ঝ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন :** সরকারের নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সামগ্রিকভাবে দেশের জনসংখ্যা প্রাক্কলন, প্রক্ষপণ ও উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এসব বিষয়কে সম্পৃক্ত করবে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জনসংখ্যা সমস্যা নিরসন সম্বলিত উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে।

**ঞ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় :** মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচির আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এসব কেন্দ্র থেকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের জন্য জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় ভূমিকা রাখবে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নিবন্ধনকৃত এনজিওদের জন্য জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

**ট) মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় :** মহিলাদের দক্ষতা-উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তার ব্যবস্থাকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং মহিলাদের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মহিলা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

**ঠ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় :** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা আয়োজন করতে পারে। এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধনে এ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করতে পারে।

**ড) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় :** পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করতে এ মন্ত্রণালয় কাজ করবে।

**ঢ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ধর্মীয় নেতা ও ইমামদের পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা এবং যৌনরোগ ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করতে পারে। এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকাশনায় পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

**ণ) ভূমি মন্ত্রণালয় :** আদর্শ গ্রাম, ছিন্নমূল ও বস্তি পুনর্বাসনসহ মন্ত্রণালয় পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যতথ্য ও সেবা কার্যক্রম চালু করবে।

**ত) শিল্প মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে গার্মেন্টসসহ শ্রমঘন (Labour intensive) কারখানাগুলোতে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যতথ্য ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে অবিবাহিত শ্রমিকদের বিলম্বে বিবাহে উৎসাহিত করা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

**থ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে পরিকল্পিত আবাসন ও নগরায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যাতে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা যায়।

**দ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রমে জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারে।

**ধ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয় ই-গভর্নেন্স কর্মসূচির ওয়েব-সাইটে জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

**ন) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় :** এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদসগণকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং তাদের মাঝে এইচআইভি/এইডসসহ বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম অঙ্গীকার হলো সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দেশের মানুষের এসকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৭৬ সালে একটি জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ

প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালে আরও একটি জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। ২০০৪ সালের জনসংখ্যানীতির উদ্দেশ্য ছিল ২০১০ সালের মধ্যে নিট প্রজনন হার-১ অর্জন করা। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় কর্মসূচিতে গতিশীলতা আনার জন্য জনসংখ্যা নীতিকে হালনাগাদ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণীত হয় জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২। ২০১১ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ। এই জনসংখ্যা প্রতিবছর ১৮-২০ লাখ বাড়ছে। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল প্রকার সেবা ও অবকাঠামোয় প্রচণ্ড চাপ বাড়ছে। তাই দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি ও কৌশলসমূহকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২ অনুযায়ী কোন সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার ১ অর্জন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে?

ক) ২০১৫ খ) ২০১৭
গ) ২০১৯ ঘ) ২০২১

২। "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়"– এটি কোন নীতির শ্লোগান?

ক) শিক্ষা নীতির খ) জনসংখ্যা নীতির
গ) শিশু নীতির ঘ) নারী উন্নয়ন নীতির

## পাঠ-১০.৬ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ (National Women Development Policy-2011)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৬.১ বাংলদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.৬.২ বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.৬.৩ বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।

### ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমণ্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। সকল ক্ষেত্রে নারীর সম-সুযোগ ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৭ সালে এদেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত

করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পূনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

## জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

১. বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
২. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৩. নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈকি, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
৪. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
৫. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
৬. নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা;
৭. নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
৮. নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
৯. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;
১০. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা;
১১. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা;
১২. রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
১৩. নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;
১৪. নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা;
১৫. নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;
১৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
১৭. প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;
১৮. বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
১৯. গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেণ্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
২০. মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা;
২১. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা;
২২. নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

## জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম

### ক) নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

১. মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে যেমন– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সম-অধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।
২. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩. নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।
৪. বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫. স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো ধর্মের, কোনো অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা।
৬. বৈষম্যমূলক কোনো আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোনো সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।
৭. গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরিতে, কারিগরি প্রশিক্ষণে, সম-পারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

৮. মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
৯. পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা, যেমন– জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।

**খ) কন্যা শিশুর উন্নয়ন**

১. বাল্য বিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।
২. কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন– খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
৩. কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানিসক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা।
৪. কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।
৫. কন্যা শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
৬. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন– রাস্তাঘাটে কন্যা শিশুরা যেন কোনোরূপ যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৭. কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করা।
৮. প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

**গ) নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ**

১. পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা।
২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।
৩. নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।
৪. নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা।
৫. নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৬. বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেণ্ডার সংবেদনশীল করা।
৭. নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।
৮. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
৯. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১০. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
১১. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষ ও যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করা।

**ঘ) সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থা**

১. সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
২. সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
৩. আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।

**ঙ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ**

১. নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসরণ করা।
২. নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।
৩. কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।
৪. মেয়েদের জন্যে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**চ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি**

১. ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগহণ নিশ্চিত করা।
২. স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা।
৩. সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৪. নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা।

**ছ) জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ**

১. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা।
২. অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
৩. নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচিতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা।
৪. সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলা।
৫. সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া।
৬. শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা।
৭. নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সম-সুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।
৮. নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া।
৯. জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১০. সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহ, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারীশ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।
১১. নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**জ) নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ**

১. হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা।
২. দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩. দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা।
৪. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
৫. জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।

**ঝ) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন**

১. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।
২. উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রধান করা।

**ঞ) নারীর কর্মসংস্থান**

১. নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
২. চাকরি ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
৩. সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকরি ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সম-সুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
৪. নারী উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৫. নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা।
৬. নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা। নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেণ্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন ও জেণ্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হবে।

**ট) সহায়ক সেবা**

সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন– শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা।

**ঠ) নারী ও প্রযুক্তি**

১. নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেণ্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
২. উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদান মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩. প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।

**ড) নারীর খাদ্য নিরাপত্তা**

১. দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
২. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

**ঢ) নারী ও কৃষি**

১. কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষিশ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা।

২. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষিশ্রমিকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।

৩. কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সমমজুরী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪. কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষিশ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**ণ) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন**

১. রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

২. নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৪. নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।

৫. নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৬. রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৭. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮. স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

**ত) নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন**

১. প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের ব্যবস্থা করা।

২. প্রশাসনিক, নীতি নির্ধারণী ও সাংবিধানিক পদে অধিকহারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা।

৩. জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া।

৪. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।

৫. সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা।

৬. কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা।

৭. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

**থ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি**

১. নারীর জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে যথা– শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা।
২. নারীর জন্য প্রাথামিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা।
৩. মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করা।
৪. এইডস রোগসহ সকল ঘাতকব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষত গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৫. নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৬. জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা।
৭. বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।
৮. উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৯. পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
১০. নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১১. মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তাবয়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।

**দ) গৃহায়ন ও আশ্রয়**

১. পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা।
২. একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসান সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
৩. নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন– হোস্টেল, ডরমিটরি, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুঃস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা করা।

**ধ) নারী ও পরিবেশ**

১. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
২. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

**ন) দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা**

১. দুর্যোগ পূর্ববতী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা।
৩. দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা।
৪. দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।
৬. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারীবান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।
৭. দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৮. দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।
৯. গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন– ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।
১০. দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

**প) অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম**

১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা।
২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

**ফ) প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম**

১. জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী নারীর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা।
২. প্রতিবন্ধী নারীদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।
৩. যে সমস্ত নারী অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা।
৪. প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৫. প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী নারীদের লালনপালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা।
৬. প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো নারী যেন জাতীয় নারী নীতির আওতায় কোনো প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা।

**ব) নারী ও গণমাধ্যম**

১. গণম্যাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
২. নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেণ্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।

**ভ) বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী**

যদি কোনো নারী বিশেষ পরিস্থিতির কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হন তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

## জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারী উন্নয়ন প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

১. নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন– মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সম্পদ নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা হবে। নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্যে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

৩. শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশুকল্যাণের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তেনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

৪. নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নারী উন্নয়নকল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

৫. তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে। উপরন্তু, তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্তির জন্যে উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬. গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা প্রদান করা হবে। সরকারি সকল কর্মকাণ্ডে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৭. নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেণ্ডার গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

৮. ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৯. নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই সচেতনতা কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে- ১) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ, ২) মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী

উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

১০. নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে। ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমণ্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৭ সালে এদেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ণ করা হয়, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারীসমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়?

ক) ১৯৯৭ সালে খ) ১৯৯৯ সালে
গ) ২০০৪ সালে ঘ) ২০১১ সালে

২। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে কোন নীতিতে?

ক) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ খ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
গ) জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ঘ) জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২

৩। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুযায়ী কন্যা শিশুর উন্নয়নে–

i. বাল্যবিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা
ii. কন্যা শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা
iii. কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকলক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১০.৭ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ (National Child Policy 2011)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৭.১ শিশু কারা তা বলতে পারবেন।
১০.৭.২ বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৭.৩ শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.৭.৪ শিশু অধিকার বাস্তবায়নে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

## ১. ভূমিকা

শিশু জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ এ সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় শিশু আইন ১৯৭৪, যা যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন ২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যত্নশীল ও সক্রিয়। বাংলাদেশের ১৮ বছরের কম বয়সের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ। সম্প্রসারিত টিকা প্রদান কার্যক্রমের (EPI) আওতায় শতকরা ৮৭ ভাগ শিশুকে আনা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে জেণ্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে যা সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDG-3) পূরণ করেছে। বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সকল শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ভোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করেছে। সনদে শিশুদের স্বার্থ বিবেচনায় প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করা ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত পরিবর্তন, উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিত্য নতুন চাহিদা ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশু নীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী ও আধুনিক একটি শিশু নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একটি সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

## ২. সংজ্ঞা

**২.১ শিশু :** শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে। দেশের প্রচলিত কোনো আইনে এর ভিন্নতা থাকলে এই নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সামঞ্জস্যবিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**২.২ কিশোর কিশোরী:** কিশোর-কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বুঝাবে।

**৩. পরিধি**

জাতীয় শিশু নীতি বাংলাদেশের নাগরিক সকল শিশুর ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনভাবে প্রযোজ্য হবে।

**৪. মূলনীতি**

৪.১ বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৪.২ শিশু দারিদ্র্য বিমোচন।

৪.৩ শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ।

৪.৪ কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ।

৪.৫ শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ।

**৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

৫.১ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ও অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গগত, ধর্মীয়, জাতিগত, পেশাগত, সামাজিক, আঞ্চলিক ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে সকল শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জন্য মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।

৫.২ কন্যা শিশু এবং প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৩ শিক্ষা ও শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের দেশ সম্পর্কে আগ্রহী ও সচেতন করে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে বিকাশ লাভ করতে পারে।

৫.৪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে শিশুদের একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে দেশ ও বিশ্বের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়।

৫.৫ শিশুদের জন্য অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৬ শিশু ও কিশোর-কিশোরীর জীবনকে প্রভাবিত করে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের মতামত প্রতিফলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৭ শিশু অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

**৬. শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ**

শিশুর নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে :

**৬.১ শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ**

৬.১.১ সকল শিশুর নিরাপদ জন্ম গ্রহণ ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গর্ভবর্তী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিচর্যার মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ জন্ম এবং বেড়ে উঠার ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রসূতিপূর্ব, প্রসূতিকালীন সময় ও প্রসূতি পরবর্তী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.১.২ শিশুমৃত্যু রোধের ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.১.৩ মায়ের স্বাস্থ্য ও শিশুর যত্ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মজীবী মায়েদের জন্য বর্ধিত ছুটির ব্যবস্থা করা হবে।

৬.১.৪ কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর সুবিধা প্রদানে কর্মস্থলে দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৫ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.১.৬ কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

## ৬.২ শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন

শিশুর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিশুর– ক) পুষ্টি, খ) স্বাস্থ্য, গ) সার্বিক সুরক্ষা, ঘ) শিক্ষা এবং ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে :

৬.২.১ শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং National Plan of Action for Nutritional Intervention কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে ও জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত বিভিন্ন পুষ্টি কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। পিতা-মাতাকে শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতকরণে সচেতন ও উৎসাহিত করতে হবে।

৬.২.২ অনূর্ধ্ব দুই বছরের শিশুদের Protein-Energy Malnutrition (U2PEM) এবং Low Birth Weight (LBW) হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.২.৩ পথশিশুসহ সকল দরিদ্র শিশুদের পুনর্বাসন ও যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তাবলয় (Social Safety Net) সম্প্রসারিত করতে হবে। অতি দরিদ্র পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে শিশুরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে ও পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে।

## ৬.৩ শিশু স্বাস্থ্য

৬.৩.১ সকল শিশুর জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্প্রসারিত টিকাদান কার্যক্রম (EPI), শৈশব-অসুস্থতার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (IMCI) ও নবজাতক স্বাস্থ্য (NBH), প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌন সংক্রামক ব্যাধিসমূহ, HIV/AIDS প্রতিরোধসহ সময়োপযোগী অন্যান্য কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৬.৩.২ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এবং চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ ধাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা হবে।

৬.৩.৩ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক মৌলিক তথ্য অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.৩.৪ শিশুর অধিকার এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিত অবহিতকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

৬.৩.৫ শিশুদের জন্য নিরাপদ পানির উৎস সুলভ রাখা এবং লবণাক্ত উপকূলীয় এলাকা ও আর্সেনিকযুক্ত পানির এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ হবে।

৬.৩.৬ বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা স্থাপন ও পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

৬.৩.৭ কন্যা শিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে আলাদা পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

## ৬.৪ শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর)

৬.৪.১ শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে।

৬.৪.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করত এসব কেন্দ্রের শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.৪.৩ ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

## ৬.৫ শিশু শিক্ষা

৬.৫.১ প্রাথমিক শিক্ষা বিন্যামূল্যে প্রদান করা হবে। অর্থনৈতিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য কারণে পশ্চাৎপদ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষাপোকরণসহ উৎসাহ প্রদানকারী বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

৬.৫.২ সকল শিশুকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার আওতায় আনা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৫.৩ আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

৬.৫.৪ শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৫.৫ মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.৫.৬ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা এবং শাস্তির ফলস্বরূপ কোনো শিশু ও কিশোর-কিশোরীর যেন শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যে শিশুবান্ধব শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে।

৬.৫.৭ দেশের প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা হবে যাতে সকল ধারার শিক্ষার্থীরা সমভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ এবং দেশের উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

৬.৫.৮ শিশুদের শিক্ষার মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুবান্ধব উন্নত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৬.৫.৯ ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিশুদের জন্য শিশুতোষ বই-পুস্তক, পত্রিকা, সিনেমা ও সুকুমার কলা চর্চার সামগ্রী বিনামূল্যে বা ভর্তূকি মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে। নানা ধরনের সহজ ও আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৫.১০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক বা বিশেষ শিক্ষা যেমন– ক্রীড়া শিক্ষা, স্কাউট, গার্লস গাইড ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৫.১১ মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় স্ব-স্ব ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৬.৫.১২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

## ৬.৬ শিশুর বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

৬.৬.১ শিশুর জন্য মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য খেলার মাঠ, খেলার সরঞ্জাম রাখা, এলাকাভিত্তিক শিশুপার্ক স্থাপন এবং নগর পরিকল্পনায় আবশ্যিকভাবে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দুর্যোগকালীন সময় ও তার পরবর্তীতে আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

৬.৬.২ শিশুরা যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশাত্মবোধ, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজ, দেশ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ, জাতীয় চার নেতার জীবন ও কর্ম এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে এই উদ্দেশ্যে শিশুতোষ চলচ্চিত্র, নাটক, চিত্রকলা ও শিল্পের অন্যান্য শাখায় শিশুদের চর্চা ও অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

৬.৬.৩ প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং লাইব্রেরি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

## ৬.৭ শিশুর সুরক্ষা

৬.৭.১. সকল প্রকার সহিংসতা, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শিশুদের উপর সহিংসতা, নির্যাতন ও অবহেলা বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৬.৭.২ আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং বিচার প্রক্রিয়ায় শিশু অংশগ্রহণের অধিকার শিশু আইনের অধীনে নিশ্চিত করা হবে।

৬.৭.৩ শিশুদের মাদক ব্যবহার প্রতিরোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ এবং মাদকাসক্ত শিশুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.৭.৪ শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, প্রলোভন বা জোর করে জড়িত করা হবে না।

## ৬.৮ প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৬.৮.১ জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৬.৮.২ প্রতিবন্ধী শিশুদের সমাজের মূলধারায় একীভূত থাকা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে।

৬.৮.৩ যে সমস্ত শিশু অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেসব শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা বিবেচনা করা হবে।

৬.৮.৪ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.৮.৫ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের লালনপালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৬.৮.৬ প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিশু যেন জাতীয় শিশু নীতির আওতায় কোনো প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা হবে।

## ৬.৯ অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৬.৯.১ অটিস্টিক শিশুদের অধিকাংশই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, তাই তাদের সমাজে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৬.৯.২ অটিস্টিক শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা পদ্ধতি এবং উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৯.৩ অটিস্টিক শিশুদের যেহেতু সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বৈকল্য থাকে, সেহেতু তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করার জন্য পরিবার বা তার বাবা-মাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬.৯.৪ অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.৯.৫ দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

## ৬.১০ শিশুর জন্ম নিবন্ধন

৬.১০.১ সকল শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা হবে।

৬.১০.২ জন্ম নিবন্ধন আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং এর প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

## ৬.১১ সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

৬.১১.১ নৃতাত্ত্বিক ও সংখ্যালঘু শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৬.১১.২ নৃতাত্ত্বিক ও সংখ্যালঘু শিশু যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## ৬.১২ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা

৬.১২.১ দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় শিশুর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে।

৬.১২.২ দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.১২.৩ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় শিশুদের বিপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি শিশু ও তাদের অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬.১২.৪ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো শিশুবান্ধব করা এবং পরিচর্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এতিম ও অসহায় শিশুদের জরুরি অবস্থায় সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা হবে।

৬.১২.৫ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও বিতরণ সামগ্রীর মধ্যে শিশুর খেলনা সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে করে শিশু দুর্যোগসংক্রান্ত ভয়ভীতি কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

৬.১২.৬ দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সংক্রামক ও পানিবাহিত রোগ থেকে রক্ষা এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিক্ষার সুবিধা পুনর্বহালের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.১২.৭ গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন– ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা হবে।

### ৬.১৩ শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ

শিশুর অধিকার ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে শিশুর উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমে তাদের মতামত ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

## ৭. কিশোর কিশোরীদের উন্নয়ন

৭.১ কিশোর কিশোরীদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.২ কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৩ কিশোর কিশোরীদের শারীরবৃত্তীয় ও আবেগজনিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রজনন স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.৪ কিশোর কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা, বিয়ে, পাচার, বাণিজ্যিকভাবে যৌন কাজে বাধ্য করা এবং অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ থেকে রক্ষার মাধ্যমে তাদের সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

## ৮. শিশুশ্রম নিরসনের পদক্ষেপসমূহ

শিশুশ্রম পর্যায়ক্রমে নিরসন করা হবে। বাস্তবতার নিরিখে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অনেক শিশু বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত। শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এর আলোকে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

৮.১ ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে নিয়োগ হতে বিরত রাখতে হবে।

৮.২ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে দুঃস্থ ও নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থাপন্ন শিশুদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাসিক মাসোহারা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে তারা পড়াশুনা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

৮.৩ শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশুকে যেন কোনো ধরনের অসামাজিক বা অমর্যাদাকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৪ কর্মস্থলে দৈনিক কর্মঘন্টা ও এর মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট সময়ে কর্মবিরতি এবং বিনিময় মজুরী নিশ্চিত করা হবে।

৮.৫ শিক্ষা ও বিনোদন শিশুর মৌলিক অধিকার, আর তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মঘণ্টা অতিক্রান্ত হবার পর নিয়োগকর্তা উক্ত শিশু শ্রমিকের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবে।

৮.৬ কর্মকালীন সময়ে শিশু কোনো ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে বা অসুস্থ অনুভব করলে মালিকপক্ষ বা নিয়োগকর্তা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৮.৭ গৃহকর্মে বা অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শিশুদের প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৮ গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা সাধারণত সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত থাকে বিধায় তাদের লেখা-পড়া, থাকা-খাওয়া, আনন্দ-বিনোদন নিশ্চিত করা এবং তাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো থেকে বিরত রাখতে হবে।

৮.৯ যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিশুরা নিয়োজিত আছে, সেখানে শিশুরা যেন কোনোরূপ শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে।

৮.১০ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমসহ বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করতে হবে।

৮.১১ শ্রমজীবী শিশুদের দারিদ্র্য চক্র হতে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতামাতাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮.১২ শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য বৃত্তি ও আনুতোষিক প্রদান করতে হবে।

৮.১৩ শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতামাতা, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮.১৪ বাংলাদেশ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

## ৯. বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ

### ৯.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৯.১.১ শিশু অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। এই কমিটির মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য সর্বোত্তম উন্নয়ন ও সুরক্ষা, শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৯.১.২ শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৯.১.৩ জাতীয় পর্যায়ে আইনের মাধ্যমে শিশুদের জন্য ন্যায়পাল (Ombudsman for Children) নিয়োগ দেয়া হবে। শিশুদের জন্যে ন্যায়পাল জাতীয় কর্মসূচিতে শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এবং জাতিসংঘ সনদ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে ভূমিকা পালন করবে।

৯.১.৪ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উপ-সচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট ও আরেকজনকে বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এসকল কর্মকর্তা শিশু বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতি তিন মাস অন্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

### ৯.২ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকাণ্ডের সমন্বয়

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি উদ্যোগকে সুসংহত ও আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে। নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ডের সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।

### ৯.৩ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

শিশুর উন্নয়ন ও অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ এবং কার্যক্রমের অগ্রগতির নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে।

### ৯.৪ গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা, চলমান উদ্যোগসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

### ৯.৫ শিশু নীতি বাস্তবায়নের জন্য অর্থসংস্থান

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুদের উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রেক্ষিতে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন ও শিশু উন্নয়নের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

### ৯.৬ আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন

জাতীয় শিশু নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হবে।

## সারসংক্ষেপ

শিশু জাতি গঠনের মূলভিত্তি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ এ সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ এ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় শিশু আইন ১৯৭৪ যা যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন ২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যত্নশীল ও সক্রিয়। বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করা ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা অন্যতম লক্ষ্য। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কমিটির (CRC Committee) সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি যুগোপযোগীকরণের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী ও আধুনিক একটি শিশু নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মানে একটি সুদূরপ্রসারী রূপকল্প।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে?

ক) ২৮ (১) খ) ২৮ (২)
গ) ২৮ (৩) ঘ) ২৮ (৪)

২। শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী কোন বয়সী শিশুদের জন্য বিকাশ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে?

ক) ৩-৫ বছর খ) ৪-৫ বছর
গ) ৫-৬ বছর ঘ) ৫-৭ বছর

৩। শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম–

i. সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা পদ্ধতি এবং উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে
ii. তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করার জন্য পরিবার বা তার বাবা-মাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে
iii. শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.৮ সমাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব (Importance of Social Policy in Social Development)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৮.১ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.৮.১ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব

সামাজিক নীতি হলো সুপরিকল্পিত সামাজিক উন্নয়নের দিকনির্দেশক। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়ন সাধন, মৌল-মানবিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা হতে পরিত্রাণ লাভ এবং সন্তোষজনক জীবনমানের নিশ্চয়তা জাতীয়ভাবে প্রত্যাশিত বিষয়। আর এসকল বিষয়ের কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

**১. সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা :** দারিদ্র্য, জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা, অপরাধ ও সন্ত্রাস, কিশোর অপরাধ, জঙ্গিবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামী, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, অর্থ পাচার, মাদকাসক্তি, মাদকপাচারসহ নানাবিধ সমস্যা বাংলাদেশের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজন সুচিন্তিত প্রতিকার ও প্রতিরোধ কার্যক্রম। আর এসকল ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

**২. পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন** : বাংলাদেশের সমাজ জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে জনগণের সামঞ্জস্যবিধানে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মূলত সামাজিক নীতি এক্ষেত্রে এমন সব দিকনির্দেশনা দেয়, যা সমাজের সকলের নিকট প্রত্যাশিত এবং যা সামাজিক গতিশীলতাকে ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সামাজিক মূল্যবোধ আদর্শ, প্রথা ও মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে এবং পরিবর্তিত বিষয়কে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

**৩. অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ :** বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিশু, নারী, প্রবীণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধি, আদিবাসী, ভূমিহীন, বেকার যুবসমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর। এদের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণে কল্যাণধর্মী কার্যক্রম আবশ্যক। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সুষ্ঠু কর্মপন্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকল শ্রেণির ভাগ্যোন্নয়ন ও স্বার্থসংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৪. সামাজিক উন্নয়ন :** সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম যুগোপযোগী করা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে সামাজিক নীতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তুলে এগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**৫. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ :** বাংলাদেশের জনজীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার জন্য বিভিন্ন সামাজিক বিপর্যয়কর অবস্থা যেমন– দুর্ঘটনা, অকালমৃত্যু, বার্ধক্য, চাকুরিচ্যুতি, বেকারত্ব, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ (বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস) ইত্যাদি দায়ী। এসকল অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। যথাযথ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রণয়নে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত সামাজিক নীতি। সুতরাং দেখা যায় বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়নে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

**৬. সম্পদের যথাযথ ব্যবহার :** সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে জনগণের প্রতিভা ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটিয়ে

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং দেশজ বস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নধারাকে ত্বরান্বিত করতে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

**৭. সমাজসেবা ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন :** বাংলাদেশে মানবকল্যাণে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারিভাবে পারিচালিত সেবা কার্যক্রমের যথাযথ ব্যবহার ও মানোন্নয়নে প্রয়োজন যথাযথ সমন্বয় সাধন। এক্ষেত্রে কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সামাজিক নীতি যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

**৮. সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ :** অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে প্রচলিত নানা কুপ্রথা, কুসংস্কার সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রয়োগ ঘটিয়ে সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

**৯. সম্পদের সুসম বণ্টন :** সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সম্পদের সুসম বণ্টন একান্ত আবশ্যক। সম্পদের সুসম বণ্টনের অভাবে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা ও অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, যা সমাজ উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীতা দূর করতে সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

**১০. সামাজিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা :** সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন তথা সমাজের জনগণের মধ্যে গঠনমূলক ও সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সামাজিক নীতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সমাজের সকলের মৌলিক স্বাধীনতা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন সাধন এবং সম্পদ ও অধিকারের যথাযথ বণ্টনে সামাজিক নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## সারসংক্ষেপ

আধুনিক যুগে সমাজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো সামাজিক নীতি। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সুষ্ঠু নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সামগ্রিক উন্নয়নে প্রয়াসী। সামাজিক নীতি বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সমাজসেবা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশক। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন তথা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সামাজিক নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নীতি যে সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো– ১) সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা, ২) পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন, ৩) অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ, ৪) সামগ্রিক উন্নয়ন, ৫) সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ৮) কুসংস্কার দূরীকরণ, ৯) সম্পদের সুসম বণ্টন এবং ১০) সামাজিক সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশক কোনটি?

ক) সামাজিক নীতি খ) সামাজিক পরিকল্পনা
গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান

২। কোনো দেশের জনগণ যে সকল বিষয় প্রত্যাশা করে–

i. মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা
ii. সন্তোষজনক জীবনমানের নিশ্চয়তা
iii. সামাজিক সমস্যা হতে পরিত্রাণ লাভ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১০.৯ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা (Problems of Social Policy Implementation)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.৯.১ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

## ১০.৯.১ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা

পরিকল্পিত ও টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়শীল দেশগুলোতে সামাজিক পরিবর্তন সাধন ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও নানাবিধ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসকল বিষয় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে তা হলো :

**১. সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব :** সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হলো পর্যাপ্ত সঠিক তথ্যের অভাব। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, জনগণের অনুভূত প্রয়োজন, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এসকল বিষয়ে যদি পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য না পাওয়া যায় তাহলে সামাজিক নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

**২. সম্পদের সীমাবদ্ধতা :** জনকল্যাণমুখী নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের স্বল্পতা বা সীমাবদ্ধতা অন্যতম অন্তরায়। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি, আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যহীনতা বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর সেবাব্যবস্থায় সময়মতো প্রয়োজন মাফিক সাহায্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তাসহ নানাবিধ কারণে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

**৩. বিশেষজ্ঞের অভাব :** সামাজিক নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বের অবদান অনস্বীকার্য। জ্ঞান-দক্ষতায় সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ না থাকায় সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষজ্ঞের অভাব দেখা দেয় দুটি কারণে। প্রথমত, উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগের অপর্যাপ্তার কারণে পেশাগত জ্ঞানের সংকীর্ণতা এবং দ্বিতীয়ত, অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বহিঃবিশেষজ্ঞ নিয়োগ। এছাড়া অনেক সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় অযোগ্য ব্যক্তিদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, এর ফলে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

**৪. জনগণের সহযোগিতার অভাব :** সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন অনেকাংশ নির্ভর করে জনগণের সক্রিয় সমর্থন, সহযোগিতা বা অংশগ্রহণের উপর। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে জনগণের সচেতনতার অভাব ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনীহা সামাজিক নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, উন্নত মানসিকতার অভাব, পরিবর্তনবিমুখতা, রক্ষণশীলতা ও ভাগ্যনির্ভরতাসহ প্রভৃতি কারণে অনেক ক্ষেত্রে নীতি বাস্তবায়নে জনগণের আগ্রহের কমতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

**৫. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এসব দেশে খুব তাড়াতাড়ি ও নির্দিষ্ট সময় পরপর সরকার পরিবর্তন হয়। এক সরকারের গৃহীত নীতি অন্য সরকার বাস্তবায়ন করতে চায়না। এসব দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রভাবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়। ফলে সামাজিক নীতি বাস্বায়নের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

**৬. সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব :** উন্নয়নশীল দেশে সরকার ও জনগণের মধ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে একটি দুরত্ব বিরাজমান। বিশেষত শহরকেন্দ্রিক জন প্রতিনিধিত্ব এসব দেশের গ্রামীণ জনগণের আশা-আকাঙ্খা, চাহিদা, প্রয়োজন পূরণ ও স্বার্থরক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে জনগণের একটি বিশাল অংশের সাথে সরকারের যোগাযোগ গড়ে ওঠে না। একারণে অনেক সময় সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন দুরূহ হয়ে পড়ে।

**৭. দক্ষ কর্মীর অভাব :** উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় বাধা হলো নীতি অনুশীলনে দক্ষ কর্মীর অভাব। কেননা নীতির সামাজিক রূপদানে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ফলাফল যাচাই ও সুপারিশ প্রদানে দক্ষকর্মীর সহায়তা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেমন দক্ষকর্মীর অভাব, তেমনি যতটুকু পাওয়া যায় তাদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

**৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বারোপ :** সাধারণত আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো সনাতন ধারণায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন ঘটাতে চায়। এক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়গুলো গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সামাজিক উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়; এর সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন উপাদানও ব্যাপক ও গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং দেখা যায় যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রধান্য দেওয়াতে সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন সমস্যাগ্রস্ত হচ্ছে।

**৯. সামাজিক সমস্যার দুষ্টুচক্র :** আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান সামাজিক সমস্যাবলী বিচিত্রমুখী ও জটিল। এসব সমস্যা একটি অপরটির সাথে এমনভাবে জড়িত যে, একটিকে প্রাধান্য দিয়ে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করলেও আশাব্যঞ্জক ফললাভ সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যার এরূপ দুষ্টুচক্র সামাজিক নীতি বাস্তবায়নকে অনিশ্চিত করে তোলে।

**১০. প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার অভাব :** সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের আগ্রহ ও জবাবদিহিতার অভাব, প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে যথাযথভাবে নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দুর্নীতি। যার ফলে নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়, উদ্দেশ্য অর্জন ব্যহত হয় এবং নীতির সুফল জনগণের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়না।

## সারসংক্ষেপ

পরিকল্পিত সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে বাস্তবমুখী সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন পর্যায় বেশ জটিল। দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতাসহ নানাবিধ কারণে নীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। সাধারণত আমাদের দেশে নীতি বাস্তবায়নে যে সকল সমস্যাগুলো বিদ্যমান তা হলো– ১) সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, ২) সম্পদের স্বল্পতা, ৩) বিশেষজ্ঞের অভাব, ৪) জনগণের সহযোগিতার অভাব, ৫) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ৬) সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব, ৭) সামাজিক নীতি অনুশীলনে দক্ষ কর্মীর অভাব, ৮) অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া, ৯) সমস্যার দুষ্টুচক্র এবং ১০) প্রশাসনিক দুর্বলতা।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত কোনটি?

ক) সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন খ) সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ

গ) সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ঘ) সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা

২। আমাদের দেশে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্তরায় হলো–

i. সম্পদের সীমাবদ্ধতা

ii. সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব

iii. দক্ষকর্মী বাহিনীর অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১০.১০ সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা (Role of Social Worker in Social Policy Formulation and Implementation)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১০.১ সামাজিক নীতি প্রণয়নে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.১০.২ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ১০.১০.১ সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে সামাজিক নীতি বহুল পরিচিত একটি প্রত্যয়। আধুনিক সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ কৌশল হিসেবে বিবেচিত। পেশাদার সমাজকর্মে মূলত ১৯৮০'র দশকে সামাজিক নীতির অনুশীলন শুরু হয়। এজন্য সমাজকর্মে সামাজিক নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বভাবতই একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের অনুশীলন করতে গিয়ে সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট কিছু পর্যায় রয়েছে। সমাজকর্মী সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিচে সামাজিক নীতি প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

**১. সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ :** বিশেষ কোনো সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে সামাজিক নীতি প্রণীত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা দ্বারা সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো মোকাবিলায় যথাযথ সামাজিক নীতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। মূলত সমাজকর্মীর কাজ হলো সমস্যার কারণ, প্রকৃতি, ব্যপ্তি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যা নির্ধারণ এবং সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে সহায়তা করা।

**২. নীতি প্রণয়নে প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ :** বাস্তবভিত্তিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক নীতি প্রণীত হয়। সমাজকর্মী সামাজিক গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত বাস্তব ও যথাযথ তথ্য সরবরাহে সহায়তা করে থাকেন। সামাজিক নীতি যাতে বাস্তবমুখী ও যথার্থ সমস্যাকেন্দ্রিক হয় সেজন্য সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের সাহায্য করতে তথ্য সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৩. নীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যের ভূমিকা পালন :** সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ কমিটির সদস্য হিসেবে কিংবা পরামর্শদাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। সমাজকর্মীগণ নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মতামত প্রকাশ ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে কমিটির সদসদের প্রভাবিত করে থাকেন। এতে বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

**৪. খসড়া নীতি প্রণয়ন :** সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো খসড়া নীতি প্রণয়ন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী যথাযথ তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নীতির খসড়া প্রস্তাব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। খসড়া প্রস্তাব তৈরির সময়ে সমাজকর্মী জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন নিশ্চিত করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন।

**৫. নীতি বিশ্লেষণ ও অনুধ্যান :** খসড়া নীতি প্রণয়নের পরবর্তী পর্যায় হলো প্রণীত খসড়া নীতি বিশ্লেষণ ও অনুধ্যান। এ পর্যায়ে নীতির বিভিন্ন দিক অনুধ্যান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর যথার্থতা যাচাই করা হয়। নীতি বিশ্লেষণ ও অনুধ্যানের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্মীগণ বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে থাকেন। পাশাপাশি সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে নীতির বাস্তব প্রয়োগ উপযোগিতা পরীক্ষা করে যৌক্তিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠায় সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

**৬. নীতির প্রচার ও জনসমর্থন আদায় :** সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রণীত খসড়া নীতির যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পর্যায়ে সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে নীতির প্রয়োজনীয়তা ও ইতিবাচক ফলাফল প্রচারে ভূমিকা রাখেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গনমাধ্যম যেমন– রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বিভিন্ন ব্লগ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই প্রচারণা চালিয়ে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া আলোচনা সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমেও জনমত গঠনে সমাজকর্মী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

**৭. খসড়া নীতির পরীক্ষামূলক অনুশীলন :** নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রণীত খসড়া নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করে এর ফলাফল মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে নীতির যথার্থতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একজন সমাজকর্মী খসড়া নীতি অনুশীলনের মাধ্যমে এর সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও সংশোধনে সহায়তা করে থাকেন।

**৮. চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন :** সামাজিক নীতি প্রণয়নের সর্বশেষ পর্যায় হলো চূড়ান্ত নীতি প্রণয়ন। খসড়া নীতি প্রণয়ন, বিশ্লেষণ ও কার্যকারিতা যাচাই শেষে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে নীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়। একজন সমাজকর্মী নীতি প্রণয়নের প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, নীতির সক্ষমতা ও প্রয়োগোপযোগিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিকে বাস্তব উপযোগী এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী একাধারে একজন সংগঠক, বিশেষজ্ঞ, জনমত গঠনকারী, গবেষক, বিশ্লেষক ও পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

## ১০.১০.২ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সামাজিক নীতির বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর মূখ্য ভূমিকা হলো প্রণীত নীতিকে বাস্তবে রূপদান করা। নীতি বাস্তবায়ন স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, সংগঠন, জনসমষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নীতির বাস্তব অনুশীলনে কতগুলো বাহন বা মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। এসকল ক্ষেত্রে সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিচে সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের বিভিন্ন মাধ্যম ও পর্যায়ে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

**১. আইন :** দেশের শাসনতন্ত্র ও সামাজিক আইনে সরকারের জনস্বার্থ ও সমাজসেবার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সংবিধান ও সামাজিক আইন সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম মাধ্যম। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সামাজিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেমন সমাজকর্মী আইন প্রণেতাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন তেমনি আইন বাস্তবায়নে আইন বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী জনগণকে আইনের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**২. প্রশাসন :** প্রশাসন ব্যবস্থা সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার। মূলত প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নীতি বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব। একজন সমাজকর্মী প্রশাসন ব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা :** সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। সামাজিক নীতি অধিকতর বাস্তবধর্মী ও কার্যকর করার অন্যতম উপায় হলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় ও জাতীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়কারীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন।

**৪. গবেষণা :** সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের উপায় ও সমস্যা দূরীকরণের কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। আবার নীতির অধিকতর কার্যকর ও সমৃদ্ধকরণে সামাজিক গবেষণা ব্যবহৃত হয়। একজন সমাজকর্মী যেমন সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে নীতি প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তেমনি নীতির যথার্থ বাস্তবায়ন, নীতিকে অধিকতর উপযোগী করে তোলাসহ নীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন।

**৫. প্রশিক্ষণ :** সামাজিক নীতির কার্যকর বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নীতির খুটিনাটি সকল বিষয়ের সঙ্গে যেমন পরিচিত করে তোলা হয়, তেমনি নীতির যথাযথ বাস্তবায়নে তাকে দক্ষ করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগ করে নীতি বাস্তবায়ন কর্মীদেরকে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে, পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে যথাযথ সামঞ্জস্যবিধানে এবং কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে পারদর্শী করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সমাজকর্মীগণ সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের এসকল পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের পাশাপাশি নীতি বাস্তবায়নে দেশজ সম্পদ ব্যবহার, কাঙ্ক্ষিত অনুকূল সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠন, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নীতি বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কর্মতৎপরতার পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন স্তরে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ পরিচালনাসহ নানামুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

## সারসংক্ষেপ

সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সমাজকর্মী change agent বা পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো সামাজিক নীতি। স্বভাবতই সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে চলমান রাখতে প্রয়োজনীয় সামাজিক নীতি প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ সমাজের অনুভূত চাহিদা বা সমস্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে সামাজিক নীতির চূড়ান্ত প্রণয়ন পর্যন্ত নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তেমনি নীতি বাস্তবায়ন স্তরেও সমাজকর্মীগণ যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পেশাদার সমাজকর্মে সামাজিক নীতির অনুশীলন শুরু হয় কবে?

ক) ১৯৬০ এর দশকে খ) ১৯৭০ এর দশকে
গ) ১৯৮০ এর দশকে ঘ) ১৯৯০ এর দশকে

২। সমাজ উন্নয়নে পরিবর্তকের বাহক কে?

ক) সমাজকর্মী খ) সাংবাদিক
গ) ইঞ্জিনিয়ার গ) সমাজবিজ্ঞানী

৩। সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মীগণ সহায়তা করেন–

i. নীতি বাস্তবায়নে দেশজ সম্পদ ব্যবহারে
ii. নীতি বাস্তবায়নে অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ গঠনে
iii. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কর্মতৎপরতায় পরিবীক্ষণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১১ পরিকল্পনা ও সামাজিক পরিকল্পনা (Planning and Social Planning)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১১.১ পরিকল্পনা কী তা বলতে পারবেন।

১০.১১.২ সামাজিক পরিকল্পনা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১০.১১.১ পরিকল্পনা কী?

কোনো কাজ করার পূর্বে কাজটি কেন, কোথায়, কীভাবে কখন এবং কার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এমন সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত পূর্বচিন্তা থাকা আবশ্যক। কেননা এরূপ পূর্বচিন্তা কাজটিকে অর্থবহ ও কার্যকর রূপদানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জন নিশ্চিত করে। কোনো কার্য সম্পাদনের এরূপ পূর্বচিন্তাই হলো পরিকল্পনা। মূলত কোনো কার্য সম্পাদনের পূর্বে নির্ধারিত চিত্র বা নকশাকে পরিকল্পনা বলা হয়। পরিরকল্পনা হলো কোনো কাজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যকার

সেতুবন্ধন। কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আওতাধীন সম্পদের সুসম বণ্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার সুশৃঙ্খল পদক্ষেপই হলো পরিকল্পনা।

অধ্যাপক নিউম্যানের মতে, পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতে কী করতে হবে, তার জন্য অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এইচ. বি ট্রেকার বলেন, পরিকল্পনা হলো সচেতন ও সুচিন্তিত নির্দেশনা, যাতে সম্মিলিত উদ্দেশ্য অর্জনের যৌক্তিক ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়।

আর্থার ডানহাম পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, পরিকল্পনা হচ্ছে মূলত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার মানসিক প্রস্তুতি, কাজ করার আগে চিন্তা করা এবং অনুমানের পরিবর্তে সঠিক তথ্যের আলোকে কোনো কাজ সম্পাদন করা।

সুতরাং বলা যায় যে, বহুমুখী অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সম্পদ আহরণ এবং আহরিত সম্পদের সুসম বণ্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াই হলো পরিকল্পনা।

### ১০.১১.২ সামাজিক পরিকল্পনা

সাধারণত সামাজিক পরিকল্পনা বলতে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনাকে বুঝায়। সমাজজীবনে বাঞ্ছিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ ও নিদনির্দেশনাই হলো সামাজিক পরিকল্পনা। মূলত জনগণের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়ন সাধনই সামাজিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্পদের সুসম বণ্টন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত দিকনির্দেশনাই হলো সামাজিক পরিকল্পনা।

সমাজকর্ম অভিধান অনুযায়ী, সামাজিক পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক কাঠামো গঠন ও যুক্তিসংগত সামাজিক পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া।

কিম্বল ইয়ং এর মতে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাামজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য গৃহীত কর্মসূচিই হলো সামাজিক পরিকল্পনা।

পি. এন শর্মা ও সি. শাস্ত্রী বলেন, সংক্ষেপে বলতে গেলে সামাজিক পরিকল্পনার প্রধান কাজ হলো ধারাবাহিক ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, যা জনগণের জীবনমানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।
সূতরাং বলা যায় যে, সামাজিক পরিকল্পনা হলো বাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জনগণের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া, যা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের কল্যাণে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়।

## সারসংক্ষেপ

আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর সমাজব্যবস্থায় মানুষ অদৃষ্টবাদিতার পরিবর্তে যুক্তিকে গ্রহণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নিতে চায়। এক্ষেত্রে কোনো কাজ করার জন্য সে পূর্বেই সবদিক চিন্তাভাবনা করে রাখে। এটাই হলো পরিকল্পনা। অন্যদিকে মানুষের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত পূর্ব সিদ্ধান্তই হলো সমাজিক পরিকল্পনা, যা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের কল্যানে বাস্তবায়িত হয়। মূলত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ, সামাজিক সংহতি স্থাপন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই হলো সামাজিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন কাজ সম্পাদনের জন্য কোনটি আবশ্যক?
ক) পূর্ব চিন্তা খ) পূর্ব পরিকল্পনা
গ) পূর্ব অভিজ্ঞতা ঘ) পূর্ব অনুমান

২। "ভবিষ্যতে কী করতে হবে, তার জন্য অগ্রিম সিদ্ধান্ত হলো পরিকল্পনা।"– উক্তিটি কার?
ক) আর্থার ডানহাম খ) অধ্যাপক নিউম্যান
গ) কিম্বল ইয়ং ঘ) শর্মা ও শাস্ত্রী

৩। সামাজিক পরিকল্পনার প্রধান কাজ হলো–
i. ধারাবাহিক ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা
ii. উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা
iii. সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১২ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ (Characteristics and Types of Planning)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১২.১ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
১০.১২.২ পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করতে পারবেন।

### ১০.১২.১ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

যেকোনো দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য প্রণীত হয় পরিকল্পনা। বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পি.এন শর্মা ও সি.শাস্ত্রী পরিকল্পনার কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– ১) একটি সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া, ২) বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ, ৩) কর্মসংস্থানসমূহের ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা, ৪) নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক, ৫) বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও তথ্যের আলোকে প্রণীত এবং ৬) পরিকল্পনা একটি চলমান ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সার্বিকভাবে পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

**১. সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টা :** পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া। কোনো একটি কাজ কেন করা হবে, কখন, কীভাবে এবং কার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে এসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করা হয়।

**২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক :** পরিকল্পনা সবসময়ই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকলে সম্পদ বিনিয়োগ, প্রকল্প গ্রহণ ও কৌশল নির্ধারণ সম্ভব হয় না। ফলে পরিকল্পনা অর্থহীন হয়ে

পড়ে। এজন্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়ে তাকে।

**৩. পরিকল্পনার তথ্য নির্ভরতা :** প্রণীত পরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবমুখী ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর হয়ে থাকে। পরিকল্পনা যেহেতু ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্দেশ করে সেহেতু অতীত এবং বর্তমানের যথাযথ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এতে একদিকে যেমন পরিকল্পনার মান বৃদ্ধি পায় তেমনি অতিদ্রুত লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হয়।

**৪. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :** উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করতে সম্পদের উৎস্য নির্ধারণ, সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, প্রাপ্ত সম্পদের খাতওয়ারী বণ্টন ব্যবস্থা পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়। মূলত পরিকল্পনা হলো কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পদের সাথে যথাযথ সামঞ্জস্যবিধান প্রক্রিয়া।

**৫. অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ :** পরিকল্পনা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া। এজন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ব্যক্তিবর্গের দেশের সামগ্রিক অবস্থা, দেশজ ও বৈদেশিক সম্পদ ও সহযোগিতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা এমনকি ভবিষ্যত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। কেননা একটি অভিজ্ঞ, দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষই পারে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে।

**৬. উত্তম বিকল্প পন্থা :** পরিকল্পনা হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনেকগুলো বিকল্প পন্থার মধ্যে উত্তম পন্থা। কেননা কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অনেকগুলো বিকল্প পথ থাকতে পারে, কিন্তু সব পথ সহজ সরল বা যথার্থ কার্যকর নয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা হলো বিকল্প পথগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম পথ।

**৭. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা :** পরিকল্পনা যেহেতু একটি দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার নির্দেশক, সেহেতু এটি সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃকও পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বিদ্যমান থাকে।

**৮. জটিল ও বহুমাত্রিক কর্মপ্রক্রিয়া :** পরিকল্পনা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক কর্মপ্রক্রিয়া। কেননা কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে তার পূর্বাপর সকল অবস্থার বিশ্লেষণ, সম্পদ ও সুযোগ চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ ব্যবহার, সময়সূচি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আর এসকল কর্মপ্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ হলো পরিকল্পনা।

**৯. পরিকল্পনার ব্যাপ্তি :** পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র পরিব্যপ্ত থাকে। প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর সকল বিভাগ ও উপবিভাগ পরিকল্পনার আওতাধীন থাকে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে গৃহীত কোনো কর্মসূচিই পরিকল্পনার বাইরে নয়।

**১০. নিরবিচ্ছিন্নতা :** পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া। একটি শেষ হতে না হতেই আরেকটির শুরু হয়। যেহেতু উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া সেহেতু উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। তাই বলা হয় পরিকল্পনা একটি নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রক্রিয়া।

একটি উত্তম পরিকল্পনায় উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরো যেসকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তা হলো– ১) পরিকল্পনার যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণীত হয়, ২) অর্জন ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকে, ৩) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পর্যাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে পরিকল্পনা প্রণীত হয়, ৪) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত থাকে, ৫) পরিকল্পনায় সম্পদ সংগ্রহ ও বণ্টনের রূপরেখা নির্দিষ্ট করা হয়, ৬) পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সংগতি রেখে পরিকল্পনা নমনীয় এবং ৯) স্থানীয় পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রণীত হয় জাতীয় পরিকল্পনা।

## ১০.১২.২ পরিকল্পনার প্রকারভেদ

পরিকল্পনা একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। বিভিন্ন পরিকল্পনাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পরিকল্পনার শ্রেণিবিন্যাসের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সার্বিকভাবে যথোপযুক্ত প্রয়োগযোগ্যতার ভিত্তিতে পরিকল্পনার শ্রেণিবিন্যাস নিচে আলোচনা করা হলো :

১. প্রায়োগিক ব্যাপকতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা দুই ধরনের। যথা :

**ক. সামষ্টিক পরিকল্পনা :** যে পরিকল্পনা জাতীয় পর্যায়ে সমগ্র দেশব্যাপী প্রয়োগের জন্য ব্যাপক পরিসরে প্রণীত হয় তাই হলো সামষ্টিক পরিকল্পনা। এ ধরনের পরিকল্পনায় একটি মাত্র পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কার্যকর থাকে।

**খ. ব্যষ্টিক পরিকল্পনা :** যখন কোনো পরিকল্পনা ব্যক্তি পর্যায়ে বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রণয়ন করা হয়, তখন তাকে ব্যষ্টিক পরিকল্পনা বলা হয়।

২. অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা দুই প্রকার। যথা :

**ক. বস্তুগত পরিকল্পনা :** পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের পর তা অর্জনের জন্য দেশে বিরাজমান উৎপাদনের উপাদানসমূহের প্রাপ্যতা ও সম্ভাব্য সম্পদের সামগ্রিক হিসেবের পর সেগুলো যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর প্রেক্ষিতে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাই হলো বস্তুগত পরিকল্পনা। বস্তুগত সম্পদ হলো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমিকের শ্রম, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি।

**খ. আর্থিক পরিকল্পনা :** যে পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা, উৎপাদনের উপাদানসমূহের বণ্টন, সম্ভাব্য, সম্পদের প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্থিক মূল্যমানের ভিত্তিতে কৌশল নির্ণয় করা হয় তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।

৩. উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে পরিকল্পনা তিন ধরনের। যথা :

**ক. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :** নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতির অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণসদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়, তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

**খ. সামাজিক পরিকল্পনা :** সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন অনাচার ও সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য গৃহীত সুপরিকল্পিত পদক্ষেপই হলো সামাজিক পরিকল্পনা।

**গ. উন্নয়ন পরিকল্পনা :** দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে রাস্তাঘাট, রেলপথ, সেতু ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা।

৪. লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে পরিকল্পনা দুই প্রকার। যথা :

**ক. প্রেক্ষিত বা স্থায়ী পরিকল্পনা :** দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিস্তৃত পরিসরে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে প্রেক্ষিত বা স্থায়ী পরিকল্পনা বলা হয়। এর মেয়াদকাল সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বছর হয়।

**খ. ঘুর্ণায়মান পরিকল্পনা :** বিভিন্ন ধরনের বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সমন্বয়ে এধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কোনো একটি ক্ষেত্রে সার্বিক লক্ষ্যার্জনে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন মেয়াদের পরিকল্পনা প্রয়োগ করে ধাপে ধাপে লক্ষ্যার্জনে অগ্রসর হওয়া এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

৫. সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা তিন ধরনের। যথা :

**ক. স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা :** সাধারণত এক বছরের বা তার কম সময়ের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। একে অনেক সময় বার্ষিক পরিকল্পনাও বলা হয়ে থাকে।

**খ. মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা :** এধরনের পরিকল্পনা সাধারণত এক বছরের বেশি কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময়কালের জন্য প্রণীত হয়। কখনো কখনো একে অন্তবর্তীকালীন পরিকল্পনাও বলা হয়।

**গ. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা :** দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সাধারণত পাঁচ বছর হতে বিশ বছর পর্যন্ত এ পরিকল্পনার মেয়াদ নির্ধারিত হয়।

এছাড়াও পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে– ক) খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও খ) প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা এবং দেশের উন্নয়ন স্তরের প্রসারতার ভিত্তিতে– ক) আঞ্চলিক পরিকল্পনা, খ) জাতীয় পরিকল্পনা ও গ) আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি শিরোনামেও পরিকল্পনার শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে কার্যসম্পাদনের একটি সুচিন্তিত ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে একটি দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। সব ধরনের পরিকল্পনায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা পরিকল্পনার গঠন, বাস্তবায়ন, কার্যক্রম প্রভৃতি দিককে নির্দেশ করে। সাধারণত পরিকল্পনায় যে সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাহলো– ১) সুশৃঙ্খল কর্মপ্রচেষ্টা, ২) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপস্থিতি, ৩) তথ্যের নির্ভরতা, ৪) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, ৫) দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন, ৬) সর্বোত্তম বিকল্প পন্থা, ৭) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, ৮) জটিল ও বহুমাত্রিক কর্মপ্রক্রিয়া ৯) পরিকল্পনার ব্যাপকতা ১০) নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা। আবার পরিকল্পনাকে প্রয়োগিক দিক ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন– ক) সমাষ্টিক পরিকল্পনা, খ) ব্যাষ্টিক পরিকল্পনা, গ) বস্তুগত পরিকল্পনা, ঘ) আর্থিক পরিকল্পনা, ঙ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, চ) সামাজিক পরিকল্পনা, ছ) উন্নয়ন পরিকল্পনা, জ) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ঝ) ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা, ঞ) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা, ট) মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা, ঠ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, ড) আঞ্চলিক পরিকল্পনা, ঢ) জাতীয় পরিকল্পনা, ণ) আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক পরিসরে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে কী বলা হয়?
ক) সামষ্টিক পরিকল্পনা খ) ব্যষ্টিক পরিকল্পনা
গ) আর্থিক পরিকল্পনা ঘ) ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা

২। সাধারণত ১ বছর বা তার কম সময়কালের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে বলা হয়–
ক) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা খ) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা
গ) মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা ঘ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

৩। কোনো দেশের সামাজিক খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য কী প্রণয়ন করা হয়?
ক) সামাজিক নীতি খ) সামাজিক কর্মসূচি
গ) সামাজিক পরিকল্পনা ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

৪। পরিকল্পনা একটি–
i. সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়া
ii. বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ
iii. চলমান ধারাবাহিক প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-১০.১৩ বাংলাদেশে গৃহীত পরিকল্পনা (Planning Adopted in Bangladesh)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১৩.১ বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন।

## ১০.১৩.১ বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশের সামাজিক পরিকল্পনা মূলত উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী পরিকল্পনা। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে কাঙ্খিত সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এদেশে বিভিন্ন মেয়াদী ও খাতওয়ারী পকিল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক পশ্চাদমুখিতা, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানাবিধ সমস্যার মধ্যে একটি সমৃদ্ধ গতিশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন সামাজিক খাত অন্তর্ভুক্ত। নিচের ছকে এসব পরিকল্পনা ও সময়কাল উপস্থাপন করা হলো–

| ক্রমিক নম্বর | পরিকল্পনাসমূহ | সময়কাল |
|---|---|---|
| ১ | প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৭৩-১৯৭৮ |
| ২ | দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৭৮-১৯৮০ |
| ৩ | দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৮০-১৯৮৫ |
| ৪ | তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৮৫-১৯৯০ |
| ৫ | চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৯০-১৯৯৫ |
| ৬ | প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা | ১৯৯৫-২০১০ |
| ৭ | পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৯৭-২০০২ |
| ৮ | দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র | ২০০৩-২০১০ |
| ৯ | দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা | ২০১০-২০২১ |
| ১০ | ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ২০১১-২০১৫ |
| ১১ | সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (প্রস্তাবিত) | ২০১৬-২০২০ |

ছক : ১০.১৩.১ বাংলাদেশের প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ

### বার্ষিক পরিকল্পনা

প্রতিবছর সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক খাতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিপরীতে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাই বার্ষিক পরিকল্পনা। সাধারণত ১ বছর মেয়াদকালের জন্য প্রণীত হয় বলে একে বার্ষিক পরিকল্পনা বলা হয়। একে এ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্লান (এডিপি) ও বলা হয়ে থাকে। বার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাকর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার প্রতি বছর বাজেট হতে অর্থের সংস্থান করে থাকে। সরকারের বাজেট হতে বরাদ্দ ছাড়াও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশ প্রকল্প সাহায্য দিয়ে তাকে। এ পরিকল্পনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নির্ণয়ে সাধারণত তিনমাস পরপর মনিটরিং করা হয়ে থাকে। দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পগুলো বিভিন্ন সামাজিক খাতভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে অর্থ বরাদ্ধ দেয়া হয়।

### পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন গতিশীল রাখতে পাঁচ বছর মেয়াদি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। সাধারণত এ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ অর্থনীতির নির্দেশকসমূহকে একটি কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য

লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এরূপ পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধিবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন, সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে পাঁচ বছর মেয়াদী (১৯৭৩-১৯৭৮) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যা প্রথম পাঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় আরোও পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০২০ সাল) প্রণয়নের জন্য সরকারের সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

**প্রেক্ষিত পরিকল্পনা**

সরকার কর্তৃক গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হচ্ছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। বর্তমানে বিশ্বে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে একটি জনপ্রিয় কর্মপরিকল্পনা হলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনা (১৯৬০-১৯৮০) প্রণয়ন করে। মূলত এই পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য গৃহীত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। সাধারণত ১০ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত এ পরিকল্পনার মেয়াদ নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০১০ থেকে ২০২১ সাল মেয়াদী 'রূপকল্প ২০২১' নামক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো– ক) দারিদ্র্য হ্রাস, অসমতা ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে জনগণকে রক্ষা করা, খ) ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করা, গ) ২০২১ সাল নাগাদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১০% এ উন্নীত করা, ঘ) ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং বেকারত্বের হার ১০% ও দারিদ্র্যের হার ১৫% এ নামিয়ে আনা, ঙ) ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা, চ) পরিবেশ সংরক্ষণ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা করা, ছ) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহার জোরদার করা, জ) ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সেবার প্রসার ঘটানো।

## সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানাবিধ আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে আরও গতিশীল করতে এবং একটি মজবুত অর্থনীতির ভিত গড়ে তুলতে বাংলাদেশে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এগুলো হলো বার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রতিবছর বার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়াও এযাবত একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-১৯৮০); ছয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮, ১৯৮০-১৯৮৫, ১৯৮৫-১৯৯০, ১৯৯০-১৯৯৫, ১৯৯৭-২০০২, ২০১১-২০১৫) ও দুটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০১০ ও ২০১০-২০২১) প্রণীত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ২০০০ সালে প্রণীত জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণসহ ২০০৩-২০১০ মেয়াদে দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?

ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে

গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

২। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো–

i. ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা

ii. ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা

iii. ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১৪ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা (Problems of Social Planning Formulation and Implementation)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১৪.১ বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.১৪.১ বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা

সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হলো পরিকল্পনা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এ যাবত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১টি দ্বিবর্ষিক পরিকল্পনা ও ১টি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, প্রণীত পরিকল্পনাগুলোর কোনোটিই সামাজিক খাতসহ অন্যান্য খাতের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। নিম্নের ছকের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো :

| পরিকল্পনাসমূহ | মোট বরাদ্ধ (কোটি টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকা) | প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা %) | অর্জিত প্রবৃদ্ধি (%) | মেয়াদাকাল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৪৪,৫৫০ | ২০,৭৪০ | ৫.৫০ | ৪.৪০ | ১৯৭৩-১৯৭৮ |
| দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা | ৩৮,৬১০ | ৩৩,৫৯০ | ৫.৬০ | ৩.৫০ | ১৯৭৮-১৯৮০ |
| ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১,৭২,০০০ | ১,৫২,৯৭০ | ৫.৪০ | ৩.৮০ | ১৯৮০-১৯৮৫ |
| ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৩,৮৬,০০০ | ২,৭০,১১০ | ৫.৪০ | ৩.৮০ | ১৯৮৫-১৯৯০ |
| ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৬,২০,০০০ | ৫,৯৮,৪৮০ | ৫.০০ | ৪.১৫ | ১৯৯০-১৯৯৫ |
| ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১,৯৫,৯৫২১ | ১৩,৭৩,৬৩০ | ৭.০০ | ৫.২১ | ১৯৯৭-২০০২ |
| ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৩,৪৭,০০০ | -- | ৮.০০ | ৬.৪০ | ২০১১-২০১৫ |

ছক : ১০.১৪.১.১ দেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা

উপর্যুক্ত ছকে দেখা যায় যে, প্রণীত পরিকল্পনার কোনোটিতেই ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

**১. পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গতা :** আমাদের দেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হলো পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গতা। বিশেষ করে পরিকল্পনার উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্য, অবাস্তব বিশেষায়িত সমষ্টি মডেল নির্ভরতা, নির্দিষ্ট

নীতি ও কর্মসূচির অপর্যাপ্ততা অর্থনৈতিক বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলোর উপেক্ষা, এসকল কারণে সামাজিক পরিকল্পনা যথাযথ পূর্ণাঙ্গতা পায়না।

**২. সম্পদের অপর্যাপ্ততা :** বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপ্রতুল সম্পদ এবং সম্পদ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা একটি বড় বাধা। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা যেমন পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার করা সম্ভব নয়, তেমনি বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য শর্তারোপ এবং দাতা গোষ্ঠীর সরবরাহকৃত বিশেষজ্ঞর পিছনে প্রদত্ত অর্থের সিংহভাগ খরচ হয়ে যাওয়ায় যথাযথভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না।

**৩. অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর অভাব :** বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হলো বিশেষজ্ঞের অভাব। যথাযথ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবীদ, সমাজবিজ্ঞানী, পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, মানবসম্পদের স্বল্পতার কারণে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না। অনেক সময় অতীত ব্যর্থতা মূল্যায়ন না করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। ফলে পরিকল্পনা কার্যকর সফল হয়না।

**৪. প্রতিশ্রুতির অভাব :** আমাদের দেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যথেষ্ট কমিটমেন্ট বা প্রতিশ্রুতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাধারণ জনগণের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতার অভাব ইত্যাদি কারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়া।

**৫. জনগণের সম্পৃক্ততার অভাব :** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততার অভাব একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। সাধারণত আমাদের দেশে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাতে সাধারণ জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনা। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটি অনীহার ভাব সৃষ্টি হয়। এজন্য সাধারণ জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকেনা।

**৬. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অভাব :** আমাদের দেশে প্রণীত সামাজিক পরিকল্পনাগুলোতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে গতানুগতিক ধারায় অনেকগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনোটির আপেক্ষিক গুরুত্ব কতখানি বা কোনোটি মূল লক্ষ্য তা নির্ধারণ করা হয়না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গৃহীত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

**৭. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা :** বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। সরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেমন সমন্বয়ের অভাব দেখা যায় তেমনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক দুর্বলতাও অন্যতম প্রধান সমস্যা।

**৮. প্রশাসনিক ব্যর্থতা :** পরিকল্পনা প্রণয়নে অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্ভরতা, বাস্তবতার আলোকে নতুন কিছু উদ্ভাবন ও গ্রহণে অনীহা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, অর্থনৈতিক বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

**৯. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অন্যতম সমস্যা হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এখানে দ্রুত সরকার পরিবর্তিত হয়। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথেই নীতিরও পরিবর্তন হয়, যা সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এছাড়া আরো যেসকল কারণে বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয় তা হলো :

ক. যোগ্য ও দক্ষ পরিকল্পনাকর্মী ও সমাজ গবেষকের অভাবে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ও যথাযথ তথ্যের অভাব;
খ. প্রেক্ষিত বা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অভাব;
গ. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা;
ঘ. প্রকলপ নকশা তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণে দীর্ঘসূত্রিতা;
ঙ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা ও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা;
চ. প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়;

ছ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দাতাগোষ্ঠীর অধিক হস্তক্ষেপ;
জ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা;
ঝ. পরিকল্পনা প্রণয়নে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ না থাকা;
ঞ. সরকারের অস্থিতিশীলতা এবং সঠিক জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকদর্শনের অভাব ইত্যাদি।

## সারসংক্ষেপ

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হলো সামাজিক পরিকল্পনা। পূর্ণাঙ্গ, বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক ও সুসম উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটলে অর্থাৎ পরিকল্পনা যদি পূর্ণাঙ্গ, বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী না হয়, তাহলে পরিকল্পনার ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না। ফলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ছয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা, একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। এছাড়া একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা চলমান রয়েছে। কিন্তু এযাবত বাস্তবায়িত পরিকল্পনাগুলোর কোনোটিই ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এজন্য দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিছু সমস্যা দায়ী। যেমন– ১) পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গতা, ২) সম্পদের অপ্রতুলতা ও সম্পদ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা, ৩) বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্বের স্বল্পতা, ৪) পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ প্রতিশ্রুতির অভাব, ৫) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের সম্পৃক্ততার অভাব, ৬) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি, ৭) প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, ৮) প্রশাসনিক ব্যর্থতা, ৯) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল কত?
ক) ৬% খ) ৭%
গ) ৮% ঘ) ৯%

২। বাংলাদেশে এ যাবৎ কয়টি পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে?
ক) ৫টি ও ১টি খ) ৬টি ও ২টি
গ) ৭টি ও ১টি ঘ) ৭টি ও ২টি

৩। বাংলাদেশে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা হলো–
i. সম্পদের অপ্রতুলতা ও সম্পদ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা
ii. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্যের অভাব
iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## পাঠ-১০.১৫ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা (Role of Social Worker in Formulation and Implementation of Social Planning)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

১০.১৫.১ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১০.১৫.১ সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্মী একজন পেশাদার সেবাকর্মী, যিনি তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল বাস্তবে প্রয়োগ করে জনকল্যাণমুখী উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকেন। অন্যদিকে সামাজিক পরিকল্পনা হলো সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের হাতিয়ার। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সরকারের সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নিচে সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

**১। পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** দেশের জনগণের চাহিদাপূরণ, সমস্যা দূরীকরণ ও সমৃদ্ধ জীবনমান অর্জনে সরকার পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী জনগণের কল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন।

**২। বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ :** পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরপরই এর কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃতি নির্ণয় এর উপর ভিত্তি করেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নির্ধারণ করা হয় এবং সম্ভাব্য সমস্যা নিরূপন ও সম্ভাব্য সম্পদ চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যথাযথ ও পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৩। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ :** জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যত বাস্তবমুখী ও সুনির্দিষ্ট হয় ততই এর অর্জন প্রয়াস সহজতর হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী বাস্তব অবস্থার উপর গবেষণা চালিয়ে সম্ভাব্য সঠিক ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে সহায়তা করে থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, দ্বৈততা ইত্যাদি পরিহারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৪। অগ্রধিকারভিত্তিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ :** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকারভিত্তিক সাজানো হয়। এ পর্যায়ে সমাজকর্মীগণ গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে বাস্তবমুখী ও অতি প্রয়োজনীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন, যেহেতু সমাজকর্মীগণ মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে বাস্তব অবস্থার খুব কাছাকাছি থাকেন সেহেতু তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা জরুরি।

**৫। সম্পদ সংস্থান :** পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সম্ভাব্য সম্পদ নিরূপণ ও উৎস নির্ণয় অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে সম্পদের সম্ভাব্য উৎস্য হতে পারে দেশজ বা স্থানীয় সম্পদ এবং বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ বা অনুদান। সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য খরচ নির্ণয় এবং দেশজ বা স্থানীয় সম্পদের উৎস্য নির্ণয়ে কার্যকর সহায়তা করে থাকেন। এছাড়া অতিরিক্ত খরচ বা সম্পদের অপচয়রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৬। বিকল্প কার্যক্রম গ্রহণ :** পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প নকশা প্রস্তুত করতে হয়। প্রকল্প নকশায় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের একাধিক বিকল্প পন্থা নির্ধারিত হয়। সমাজকর্মীগণ সামাজিক পরিকল্পনার বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গ্রহণযোগ্য সর্বোত্তম বিকল্প পন্থা বা কার্যক্রম নির্ধারণে যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

**৭। সম্পদ বরাদ্দ :** পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের কার্যধারা নির্ণয়ের পর খাতওয়ারী সম্পদ নির্ধারণ করতে হয়। সমাজকর্মীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত নির্ণয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে থাকেন।

**৮। বাস্তবায়ন :** প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মী একদিকে যেমন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করেন, তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনেও যথাযথ ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে পরিকল্পনার যথার্থতা উপস্থাপন করে এর বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালিয়ে থাকেন।

**৯। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :** পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে যাবতীয় কর্মতৎপরতা যথাযথভাবে চলছে কি না তা যাচাই করা এবং উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে সমাধান ব্যবস্থা উদ্‌ঘাটন করাই হলো পরিবীক্ষণের কাজ। মূলত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায় থেকে চলমান থাকে। কারণ মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম। সমাজকর্মীগণ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের শেষ অবধি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনার অভীষ্ঠ লক্ষ্যার্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

## সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মী একজন পেশাদার সেবাপ্রদানকারী। তিনি তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও কৌশল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করে যথাযথ ভূমিকা রাখেন। সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশিকা হলো সামাজিক পরিকল্পনা। একজন সমাজকর্মী সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন। সাধারণত একজন সমাজকর্মী এক্ষেত্রে তিন ধরনের মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রথমত, সংশিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয়ত, জনসচেতনতাকারী হিসেবে তিনি লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। তৃতীয়ত, উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে সমাজকর্মী সমাজের চাহিদাপূরণ, সমস্যা দূরীকরণ ও সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নে কে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন?

ক) সমাজকর্মী খ) পরিকল্পনা প্রণয়নকারী
গ) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী ঘ) অর্থনীতিবিদ

২। মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ হিসেবে সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়?

ক) পরিকল্পনার শুরুতেই খ) পরিকল্পনার শেষে
গ) পরিকল্পনা শুরু থেকে শেষ অবধি ঘ) পরিকল্পনার মাঝামাঝি পর্যায়ে

৩। সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা হলো–

i. তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা
ii. জনসচেতনকারী হিসেবে জনগণকে পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা
iii. উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে পরিকল্পনা গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কবে জনসংখ্যাস্ফীতিকে ১ নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৬ সালে
গ) ২০০১ সালে ঘ) ২০১২ সালে

২। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর কোনটি?
ক) পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি খ) সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি
গ) অষ্টম থেকে একাদশ শ্রেণি ঘ) নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

৩। সামাজিক পরিকল্পনার পথপ্রদর্শক হিসেবে কোনটিকে নির্দেশ করা হয়?
ক) সামাজিক নীতি খ) সামাজিক কার্যক্রম
গ) সামাজিক উন্নয়ন ঘ) সামাজিক গবেষণা

৪। প্রতিবছর কোন দিনকে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়?
ক) ২ জানুয়ারি খ) ২ ফেব্রুয়ারি
গ) ২ জুন ঘ) ২ জুলাই

৫। সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা কয় ধরনের?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

৬। ভিশন ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার কত শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে?
ক) ৫ শতাংশ খ) ১০ শতাংশ
গ) ১৫ শতাংশ ঘ) ২০ শতাংশ

৭। একটি জাতিকে দ্রুত মানব সম্পদে পরিণত করার যথার্থ উপায় হলো–
i. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার
ii. কৃষি শিক্ষার বিস্তার
iii. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষার বিস্তার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। জনসংখ্যা কার্যক্রমে যে সকল মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অপরিহার্য–

i. স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
ii. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
iii. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) ও মহিলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং ওসিসির কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া নির্যাতনের শিকার নারীদের মানসিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টারের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে।

৯। উদ্দীপকে সরকারের কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে?

ক) জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ খ) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
গ) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ ঘ) জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২

১০। উক্ত নীতিতে উদ্দীপকে উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ ছাড়া আরো যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে–

i. বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া
ii. বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিতহারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
iii. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গণমাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

## খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকার বস্তি, ভাসমান ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

ক) জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ী শিশু কারা? ১
খ) সামাজিক নীতি বলতে কী বোঝেন? ২
গ) উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) নিরাপদ মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমেই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব"–আপনি কী উক্তিটির সাথে একমত? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

২। মানহা ও জেরিন দুই বান্ধবী। দুজনই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচএসসি প্রোগ্রামের প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। উভয়ের মধ্যে একদিন সামাজিক পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

**মানহা :** সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অনেক সমস্যা রয়েছে।

**জেরিন :** একজন সমাজকর্মী সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বহুমূখী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

ক) সর্বপ্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণীত হয় কোন দেশে? ১
খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝেন? ২
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত মানহার বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত জেরিনের বক্তব্যের সাথে আপনি কী একমত?– উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ : ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭ : ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৮ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৯ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১০ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১১ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১২ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১৩ : ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১৪ : ১। গ ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১৫ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১০ : ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ ৫। খ ৬। গ ৭। খ ৮। ঘ ৯। খ ১০। ঘ